



# জাতীয় শিক্ষা নীতি

প্রসারিত শিক্ষা নীতি, ১৯৯৯ (খসড়া)

**শিক্ষা মন্ত্রণালয়**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# সচীপত্র

সারসংক্ষেপ.....	১
প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাঃ.....	২
গণশিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাঃ.....	৩
মাধ্যমিক শিক্ষাঃ.....	৪
বৃত্তিমূলক (ভোকেশনাল) ও কারিগরী শিক্ষাঃ.....	৬
মাদ্রাসা শিক্ষাঃ.....	৭
ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষাঃ.....	৮
উচ্চ শিক্ষাঃ.....	৯
প্রকৌশল শিক্ষাঃ.....	১১
চিকিৎসা, সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষাঃ.....	১২
বিজ্ঞান শিক্ষাঃ.....	১৩
কারবার (বিজনেস) শিক্ষাঃ.....	১৫
কৃষি শিক্ষাঃ.....	১৬
ললিতকলা শিক্ষাঃ.....	১৮
আইন শিক্ষাঃ.....	১৮
নারী শিক্ষাঃ.....	২০
বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, সামরিক বিজ্ঞান শিক্ষা, স্কাউট ও গার্ল গাইড শিক্ষাঃ.....	২১
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান.....	২৩
পরীক্ষা ও মন্যায়নঃ.....	২৪
ছাত্রকল্যাণ ও নির্দেশনাঃ.....	২৫
ছাত্রছাত্রী ভর্তিঃ.....	২৬
শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষকদের মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব.....	২৬
শিক্ষক প্রশিক্ষণঃ.....	২৬
শিক্ষকদের মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্বঃ.....	২৭
শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকঃ.....	২৮
শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাঃ.....	৩০
প্রাথমিক শিক্ষাঃ.....	৩১
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাঃ.....	৩১
অর্থায়নঃ.....	৩৩

## অধ্যায়-১

### সারসংক্ষেপ

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- (1) ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মঙ্গ্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।
- (2) বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীকে সচেতন করা।
- (3) মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা এবং তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং চরিত্রে সুনামগরিকের গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো।
- (4) দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় পরিবর্তন আনার জন্য শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী, উৎপাদনক্ষম, সৃজনশীল করে তোলা এবং শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসমৃদ্ধ, দায়িত্ববান ও কর্তব্যপরায়ণ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা।
- (5) কাঙ্ক্ষিত শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্বয়ং নির্বিশেষে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমগ্নক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।
- (6) বিশ্বভ্রাতৃত্ব, অসাম্প্রদায়িকতা, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।
- (7) গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে সহায়তা করা।
- (8) শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে পর্যাবর্তী স্তরে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি দৃঢ় করা ও এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করা।
- (9) জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা ও নৈতিক মঙ্গ্যবোধ বিকশিত করে বংশ পরম্পরায় হৃদয়ঙ্গর করানো।
- (10) দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।
- (11) বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টির লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষালান্ধের সমান সুযোগ-সুবিধা অর্জিত করা।
- (12) শিক্ষায় জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে নারী পুরুষ বৈষম্য দূর করা।
- (13) শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো।
- (14) পরিবেশ-সচেতনতা সৃষ্টি করা।

## প্রাক- প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাঃ

জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অত্যধিক। দেশের সব মানুষের শিক্ষার আয়োজন এবং জনসংখ্যাকে জনসমৃদ্ধ পరిশত করার অন্যান্য ধাপ প্রাথমিক শিক্ষা। দেশের উন্নতির লক্ষ্যে সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অপরিহার্য। বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষার মান সন্তোষজনক নয়। এ অবস্থার অবসান বাঞ্ছনীয়। প্রাথমিক শিক্ষার পর অনেকে কর্মজীবন আরম্ভ করে, অনেকে পরবর্তী শিক্ষাস্তরে প্রবেশ করে। প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের মৌলিক চাহিদা পূরণ, শ্রমের প্রতি আকর্ষণ এবং শিশুদের মধ্যে দেশপ্রেম, নাগরিকতাবোধ, কর্তব্যবোধ, কৌতুহল, সৃজনশীলতা, অধ্যবসায়, সদাচার, ন্যায়নিষ্ঠা ইত্যাদি বাঞ্ছিত গুণাবলি অর্জন করতে সহায়তা করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা দূর করে একে জাতির শিক্ষার স্বার্থে নিয়োজিত করতে হবে।

## সুপারিশঃ

- (1) প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ২০১০ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে আট বছর করা হবে। এজন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ-সুবিধা বাড়তে হবে।
- (2) সমগ্র দেশে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা প্রয়োজন। শিক্ষার বিষয় হবে মাতৃভাষা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ ও বিজ্ঞান। এছাড়া থাকবে চারু ও কারুকলা, শারীরিক শিক্ষা, সংগতি ইত্যাদি। তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজি ভাষা এবং ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। প্রথম শ্রেণী থেকে সহপাঠ্যক্রমিক বিষয় থাকবে।
- (3) প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন ধারার মধ্যে যে বৈষম্য রয়েছে তার অবসান ঘটিয়ে সবার জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে একই মান ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একই ধারার শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা আবশ্যিক।
- (4) প্রাথমিক স্তরের শেষ তিন শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের জীবন পরিবেশের উপযোগী কিছু বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান করতে হবে।
- (5) প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১ : ৩৫।
- (6) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ধারাবাহিক মধ্যায়ন এবং তৃতীয় থেকে সকল শ্রেণীতে সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষা চালু করা যেতে পারে। পঞ্চম শ্রেণীর শেষে বৃত্তি পরীক্ষা এবং অষ্টম শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষা হবে।
- (7) প্রথম শ্রেণীর প্রথম ছয় মাসের শিক্ষাকে প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা হিসেবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা যায়।
- (8) শিক্ষক নিয়োগের সর্বনিম্ন সাধারণ যোগ্যতা হবে নিম্ন প্রাথমিকদের জন্য একটি দ্বিতীয় বিভাগসহ এইচএসসি পাশ মহিলা এবং উচ্চ প্রাথমিকের জন্য একটি দ্বিতীয় বিভাগসহ স্নাতক ডিগ্রিধারী মহিলা বা পুরুষ। প্রধান শিক্ষকের সরাসরি নিয়োগের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হবে দ্বিতীয় বিভাগে স্নাতক এবং তিন বছরের মধ্যে সিইনএড বা বি এড (প্রাইমারি) অর্জন করতে হবে।

- (9) শিক্ষক নির্বাচনের জন্য সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ একটি পৃথক শিক্ষক নির্বাচনী কমিশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- (10) শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের সুযোগ এবং প্রশিক্ষণের সংগে পদোন্নতির যোগসত্র স্থাপন করা আবশ্যিক। উচ্চতর ডিগ্রিধারী যোগ্যতাসম্পন্নদের সরাসরি নিয়োগ এবং পদোন্নতির মাধ্যমে উচ্চতর পদ পল্লনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- (11) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিভিন্ন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং কর্মকালীন প্রশিক্ষণের সুযোগ থাকতে হবে।
- (12) ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারি এডুকেশন (নেপ) -কে অভীষ্ট মানের শীর্ষ পর্যায়ের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে।
- (13) বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সক্রিয় করা প্রয়োজন।
- (14) প্রাথমিক স্তরের সব ধরনের শিক্ষক ও কর্মচারীর চাকরি জাতীয়করণ করে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা উন্নয়ন ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব স্থানীয় সরকার ও ম্যানেজিং কমিটির ওপর ন্যস্ত করা যেতে পারে।
- (15) তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের কাজ যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।
- (16) প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীন বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে।
- (17) শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়াতে হবে। দুই হাজার সাল নাগাদ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অন্তত তিন শতাংশ এবং সমগ্র শিক্ষার জন্য অন্তত পাঁচ শতাংশ উন্নীত করা উচিত।
- (18) সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমগ্র জাতিকে সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে হবে।

### গণশিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাঃ

বিশ্বের সর্বাধিক নিরক্ষর জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বর্তমানে সাত বছরের বেশি বয়সীদের স্বাক্ষরতার হার শতকরা ৪৪। দেশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অপ্রতুলতা, অনমনীয়তা ও অব্যবস্থার কারণে নিরক্ষর নারী-পুরুষের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। নিরক্ষরতা সমস্যা দূর করার জন্য গণশিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। ২০০৫ সালের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার অন্তত ৯০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে।

### সুপারিশঃ

- (1) আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় অংশ নিতে পারছে না বা ভর্তি হয়েও বিদ্যালয় থেকে বারে পড়ছে এমন সব বধিঃ শিশু কিশোরের জন্য উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালিত হবে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনকারী

শিশুকিশোরেরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে। এ শিক্ষায় ভর্তি হওয়ার বয়স আট বছর এবং ভর্তির বয়সসীমা ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে।

- (2) বয়স্ক শিক্ষার আওতায় তিনটি ধারা থাকবে- স্বাক্ষরতা শিক্ষা, সচেতনতা শিক্ষা ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের শিক্ষা। বয়স্ক স্বাক্ষরতার কোর্স চাহিদা অনুসারে প্রণীত হবে। গণশিক্ষার জন্য শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- (3) স্বাক্ষরতায় অর্জিত দক্ষতাকে অটুট রাখার জন্য অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ রাখা বাঞ্ছনীয়। গ্রামে পর্যায়ে অনুশীলন চক্র ও গ্রামশিক্ষা-মিলনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। গণশিক্ষার জন্য লোককেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- (4) সমন্বিত স্বাক্ষরতা অভিযানে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজ বিভিন্ন পদ্ধতি, উপকরণ, প্রক্রিয়া ও অধীষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সমন্বয় ঘটিয়ে কম সময়ে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে পারে।
- (5) বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে দূরশিক্ষণের পদ্ধতিতে স্বাক্ষরতা কর্মসূচি পরিচালনা করা যেতে পারে।
- (6) গণশিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রসারের জন্য যে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে তা পূরণ করার জন্য আইনগত কাঠামো প্রবর্তন প্রয়োজন।
- (7) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে বাংলাদেশ গণশিক্ষা ফাউন্ডেশন নামে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে হবে। এই ফাউন্ডেশন গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মঙ্গল দায়িত্বে থাকবে এবং অর্থায়নের ব্যবস্থা করবে।
- (8) গণশিক্ষা প্রসারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং জাতীয় গণমাধ্যমের ভূমিকা সমন্বয় করতে হবে।

## মাধ্যমিক শিক্ষাঃ

বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামোর নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর অংশটি মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর হিসেবে বিবেচিত হবে। এ স্তরের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা সামর্থ্য অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন ধারায় যাবে, না হয় বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের পথে যাবে। এই স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার্থীর মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন, কর্মজগতের জন্য শিক্ষার্থীদের তৈরি করা, উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করা ইত্যাদি। মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর তিনটি ধারা থাকবে-সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ধারা। সব ধারাতেই বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। প্রত্যেক ধারা কয়েকটি শাখায় বিভক্ত থাকবে এবং কয়েকটি সাধারণ আবশ্যিক বিষয় থাকবে। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর এক ধারা থেকে অন্য ধারায় গমনের পথ খোলা থাকবে।

## সুপারিশঃ

- (1) মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর হবে চার বছরের- নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ধারায় নির্ধারিত অভিন্ন শিক্ষাক্রম অনুসরণ করতে হবে এবং এই স্তরের শিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষা বলে অভিহিত করা হবে।

- (2) মাধ্যমিক স্তরে অভিনু শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসচী এবং প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক প্রশয়নের দায়িত্ব পালন করবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।  
মাদ্রাসা ও বৃত্তিমলক শিক্ষার বিশেষ পাঠ্যসচী ও পাঠ্যপুস্তক প্রশয়নের দায়িত্ব থাকবে যথাক্রমে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের।
- (3) বর্তমান উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী সংযোজন করতে হবে এবং উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোতে নবম-দশম শ্রেণী খোলার ব্যবস্থা করতে হবে।
- (4) সকল বিষয়ের শিক্ষকের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে। শম্য পদ পন্নশের সময়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীদের নিয়োগ করতে হবে। প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকগণকে অনতিবিলম্বে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।
- (5) সুল্লু পাঠদানের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ নিশ্চিত করতে হবে। খেলাধুলার সরঞ্জাম ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- (6) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়মিত পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- (7) শিক্ষক সমাজের একাংশের নৈতিকতাবোধের অভাবে দেশে ব্যাপকভাবে প্রাইভেট টিউশনের ব্যবস্থা এবং কোচিং সেন্টার চালু হয়েছে। অনতিবিলম্বে তা বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- (8) দশম শ্রেণীর পর একটি বহিঃ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এর নাম হবে মাধ্যমিক প্রথম পর্ব। এ পরীক্ষার ফলাফলের সংগে অন্তঃপরীক্ষার ফলাফল সমন্বিত করে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। দ্বাদশ শ্রেণী শেষে অনুরূপ একটি বহিঃপরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং নাম হবে মাধ্যমিক দ্বিতীয় পর্ব। এতে অন্তঃপরীক্ষার ফলাফলের সমন্বয় করতে হবে। পরীক্ষার মন্যায়ন হবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে।  
প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্বের নম্বর যোগ করে মাধ্যমিক স্তরের চূড়ান্তফল নির্ধারিত হবে।
- (9) মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক শিক্ষার্থীর জন্য অনুপাত হবে ১ : ৪০।
- (10) শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। বিদেশীদের জন্য ইংরেজি মাধ্যম চালু থাকবে। তবে সেক্ষেত্রে সহজ বাংলা আবশ্যিক হিসেবে পাঠ্য থাকবে।
- (11) সবার নির্ধারিত হারের চেয়ে যেসব প্রতিষ্ঠান বেশি হারে বেতন আদায় করে, যারা চাঁদা আদায় করে, যাদের নিজস্ব আয়ের উৎস আছে এবং মিশনারি, ট্রাস্ট ও দেশী বিদেশী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে সরকারের শিক্ষাখাত থেকে বরাদ্দ দেওয়া চলবে না। তবে অভিনু শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসচী ও অন্যান্য নীতিমালা বাধ্যতামলকভাবে অনুসরণ করতে হবে। সরকারের অনুমতিক্রমে কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ও' লেবেল 'এ'-লেবেল চালু রাখতে পারবে।
- (12) বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে যে, অস্তিত্বহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে কিছুসংখ্যক ব্যক্তি শিক্ষকদের প্রাপ্য সরকারি অনুদান ভোগ করছে। এ ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের মাধ্যমে এসব চিহ্নিত করে যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- (13) ক্যাডেট কলেজগুলোতে মেধার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ দিতে হবে এবং ক্যাডেট কলেজের ব্যয় নির্বাহ হবে সামরিক বাজেট বরাদ্দ থেকে।

## বৃত্তিমলক (ভোকেশনাল) ও কারিগরী শিক্ষাঃ

দক্ষ জনশক্তি জাতীয় উন্নয়নের মঙ্গল চাবিকাঠি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ফলে বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন কৌশল ও পদ্ধতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। উন্নয়নশীল দেশগুলো মুক্তবাজার অর্থনীতিতে ব্যবসা বাণিজ্য, পরিবহন, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, দক্ষ জনশক্তি রফতানি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত অসম ও প্রতিকূল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এ অসম প্রতিযোগিতায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি ও শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের অফুরন্ত জনসমৃদ্ধিকে বৃত্তিমলক এবং প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান শিক্ষা দ্রুত সমৃদ্ধিস্থার শের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

### সুপারিশঃ

- (1) জাতীয় দক্ষতা মান তিন, দুই ও এক পর্যায়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষাক্রম (মাদ্রাসা শিক্ষাসহ) পর্যায়ক্রমে বৃত্তিমলক করতে হবে। শিল্প কারখানা ও বৃত্তিমলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে স্যানুইচ প্রোগ্রামের মাধ্যমে মাস্টার ক্রাফটসম্যান সৃষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে।
- (2) ডিপোমা স্তরের সকল কারিগরি শিক্ষার মেয়াদ বর্তমানে প্রচলিত তিন বৎসর প্রাতিষ্ঠানিক এবং দুই মাস শিল্প কারখানায়/ মার্চ পর্যায়ে সংযুক্তির স্থলে তিন বৎসর ছয় মাস প্রাতিষ্ঠানিক এবং ছয় মাস শিল্প কারখানায়/ মার্চ পর্যায়ে সংযুক্তি করতে হবে। কারিগরি শিক্ষা সমৃদ্ধিস্থার শের লক্ষ্যে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং এ ধরনের অন্যান্য ইনস্টিটিউটের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।
- (3) কারিগরি ডিপোমা পর্যায়ে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীকে ক্রেডিট সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্নাতক পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষা কোর্সে (ইনজিনিয়ারিং, টেক্সটাইল, কৃষি ইত্যাদি) ভর্তির সুযোগ দিতে হবে।
- (4) প্রকৌশল ডিপোমা ও অন্যান্য ডিপোমা পর্যায়ে কারিগরি ও বৃত্তিমলক প্রতিষ্ঠানের তৌত সুবিধাদির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোর্সগুলো দুই শিফটে চালু রাখতে হবে।
- (5) বৃত্তিমলক, প্রকৌশল ডিপোমা ও ডিপোমা পর্যায়ে অন্যান্য কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুবিধাদি ব্যবহার করে স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর জন্য জাতীয় দক্ষতা মানের বেসিক ট্রেড তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম গ্রেডের উপানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- (6) বৃত্তিমলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক শিক্ষার্থী অনুপাত ১ঃ ১০ করতে হবে।
- (7) সর্বস্তরে সকল শিক্ষকের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে শিল্প কারখানায় বাস্ব প্রশিক্ষণ বাধ্যতামলক করতে হবে। সকল বৃত্তিমলক ও কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ভিটিটিআই ও টিটিসি এর সংখ্যা বৃদ্ধি করে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র সমৃদ্ধিস্থার করতে হবে এবং দরশিক্ষণের মাধ্যমেও প্রয়োজনীয় শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- (8) বৃত্তিমলক ও কারিগরি শিক্ষার জন্য বাংলা ভাষায় পর্যাপ্ত পুস্তক প্রশয়ন, অনুবাদ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

## মাদ্রাসা শিক্ষাঃ

মাদ্রাসা শিক্ষার দুটি ধারা- একটি ইসলামি শরীয়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত, অপরটি অপারাপর জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধিকৃত। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষা পরস্পর পরিপূরক। এর লক্ষ্য শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিক বিষয়ে সর্বাংগীন বিকাশ ও উন্নয়ন সাধন করা। শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আলাহতায়ালা ও তাঁর রাসুল (সঃ) এর প্রতি অটল বিশ্বাস গড়ে তোলা, যেন এ বিশ্বাস তার সমগ্র চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে। মাদ্রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্যে হল ইসলামের যথার্থ সেবক ও রক্ষকরূপে শিক্ষার্থীদের তৈরি করা। তাদের এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন তারা ইসলামের আদর্শ ও মঙ্গলনীতিকে ভাল করে জানে, সে অনুসারে সুদৃঢ় নির্ভরযোগ্য চরিত্রের অধিকারী হয় এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে সেই আদর্শ ও মঙ্গলনীতির প্রতিফলন ও তার উন্নয়ন বিধানে উদ্যোগী হয়।

## সুপারিশঃ

- (1) বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে প্রতিষ্ঠিত। এই শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় রেখে একে আরও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া দরকার যাতে এ শিক্ষাব্যবস্থা নতুন প্রাণরসে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে।
- (2) বর্তমানে বাংলাদেশে ইবতেদায়ি পাঁচ বছর, দাখিল পাঁচ বছর, আলিম দুই বছর, ফাযিল দুই বছর ও কামিল দুই বছর মেয়াদি। একে পুনর্বিন্যাস করে ইবতেদায়ি আট বছর, দাখিল দুই বছর, আলিম দুই বছর, ফাযিল তিন/চার বছর, কামিল দুই/এক বছর মেয়াদি করতে হবে।
- (3) সাধারণ শিক্ষার ন্যায় মাদ্রাসা শিক্ষা ধারায়ও নারী শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে।
- (4) মাদ্রাসা শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা ভাষা, তবে ক্ষেত্রবিশেষে আরবি ভাষাও ব্যবহৃত হতে পারে।
- (5) সাধারণ শিক্ষা ধারায় অনুসৃত মন্যায়ন প্রক্রিয়া মাদ্রাসা শিক্ষা ধারায়ও অনুসরণ করতে হবে।
- (6) সাধারণ শিক্ষার ন্যায় মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতদের জন্য উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ সমভাবে উন্মুক্ত রাখা হবে। এই উদ্দেশ্যে গাজীপুরে স্থাপিত মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কলেজ/ইনস্টিটিউট স্থাপন করতে হবে।
- (7) মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীগণ দেশে ও বিদেশে নিয়োগক্ষেত্রে চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলার সুযোগ পায়। এ উদ্দেশ্যে অর্জনের লক্ষ্যে নির্বাচিত মাদ্রাসাগুলোর জন্য বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ন্যায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং ভৌত অবকাঠামো নির্মাণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

- (8) সাধারণ শিক্ষার ন্যায় মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় সংস্কার, শিক্ষা উপকরণ, বৃত্তিদান, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ ইত্যাদির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- (9) মাদ্রাসা শিক্ষার ইবতেদায়ি, দাখিল ও আলিম স্তরে স্বীকৃতি প্রদান, নবায়ন, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রশয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ, পরিদর্শন, সনদ প্রদান ইত্যাদি কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে প্রয়োজনের নিরিখে পুনর্গঠন করে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করতে হবে।
- (10) মাদ্রাসা শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ শিক্ষার সর্বস্তরে একাডেমিক পরিদর্শনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা সুচারুরূপে পরিচালনার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য পৃথক পরিচালক (মাদ্রাসা) এর পদ থাকবে। মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চ পর্যায় তত্ত্বাবধানের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শাখা স্থাপন করা হবে। তবে মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে এবং সাধারণ শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ের মধ্যে মানের সমতা নির্ণয়ের দায়িত্ব থাকবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের।

## ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষাঃ

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর আচরণগত উৎকর্ষসাধন এবং জীবন ও সমাজে নৈতিকতার প্রয়োগের মানসিকতা ও চরিত্র গঠন। বর্তমানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীর জন্য নিজ নিজ ধর্মীয় বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

## সুপারিশ

### ইসলাম শিক্ষাঃ

- (1) শিক্ষার্থীদের মনে আলাহ, রাসুল ও আখিরাতের প্রতি অটল ঈমান ও বিশ্বাস গড়ে তুলতে হবে।
- (2) ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিকে সম্বন্ধক ভাৱভাবে অবহিত হওয়ার জন্য উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রশয়ন করতে হবে।
- (3) সালাত, সাওম, হাকাত ও হজ্জের তাৎপর্য বর্ণনাসহ যথার্থভাবে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- (4) শিক্ষার্থীর চরিত্রে মহৎ গুণাবলি অর্জনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে হবে। ইসলাম শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলি ও বিষয়বস্তু কেন্দ্র করে প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রাথমিক যোগ্যতা চিহ্নিত করতে হবে।

### হিন্দুধর্ম শিক্ষাঃ

- (1) সকল ধর্মের শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষক ও কোর্সের ব্যবস্থাসহ সমান ব্যবস্থা ও সুযোগ থাকবে। প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পর্ক পরিচয়মূলক জ্ঞান দিতে হবে। প্রাথমিক স্তরে ধর্মীয় তত্ত্ব ও উপাখ্যান জানবে এবং ধর্মের অনুষ্ঠান সম্পর্ক জানবে।
- (2) মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ধর্ম দর্শন, ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মীয় উপাখ্যান, মহাপুরুষদের জীবনী, নিজ নিজ ধর্মীয় ভাষা ও সকল ধর্মের নৈতিক উপাখ্যান সংবলিত নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

### বৌদ্ধধর্ম শিক্ষাঃ

সকল শ্রেণীর বৌদ্ধ শিক্ষার্থীর জন্য বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। বিভিন্ন শ্রেণীতে পালি ভাষা শেখার ব্যবস্থা থাকবে। সনাতন পদ্ধতির সনদপত্রের সমতা বিধান করতে হবে। সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ডকে স্বায়ত্বশাসিত বোর্ডে রূপান্তর করতে হবে।

### খ্রিস্টধর্ম শিক্ষাঃ

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে থাকবে নৈতিক শিক্ষা। মাধ্যমিক স্তরে খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

### উচ্চ শিক্ষাঃ

উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য হবে জ্ঞান সঞ্চারণ ও নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন এবং সেই সংগে দক্ষ জনসম্পদ গড়ে তোলা। বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রগুলোর জন্য স্বাধীনতা ও স্ব-শাসনের অধিকার অপরিহার্য। বর্তমানে জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানসাধনায় নিযুক্ত বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের সাধনার ক্ষেত্রকে ক্রমাগত সংকুচিত করেছেন আপন বিষয়ে গভীরতা অর্জনের প্রয়োজনে। ফলে বিভাজন ঘটছে জ্ঞানের জগতে। অন্যদিকে একটি বিপরীত প্রক্রিয়াও চলছে এবং তা হল জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পারস্পরিক নির্ভরতা বৃদ্ধি এবং এর ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, অর্থনীতি ও অন্যান্য বিজ্ঞান পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। তার সংগে যোগ হচ্ছে নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার ও বিশৃঙ্খলিত সম্পর্ক অভিনব উপলব্ধি। এই পরিপ্রেক্ষিতেই জ্ঞানের জগতে সকল বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তি অতিক্রম করে একটি সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। বর্তমানে প্রচলিত উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশের মতো একটি স্বাধীন দেশের প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে মেটাতে সমর্থ নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ শিক্ষার সামগ্রিক ব্যবস্থার পুনর্বিদ্যায় আবশ্যিক।

### সুপারিশঃ

- (1) মাধ্যমিক শিক্ষা সফলভাবে সমাপ্ত করার পর ছাত্রছাত্রী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ করবে। এক্ষেত্রে মেধাগত সমতা নিশ্চিত করার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসচি সাধারণ শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসচির সমমানের হতে হবে।
- (2) শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে পারে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠাসমূহ যেমন- বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও কলেজে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হবে। শিক্ষার্থীর মেধা, আগ্রহ ও প্রবণতার ভিত্তিতে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ লাভ ঘটবে। কোটা পদ্ধতি বা অন্য কারণে যোগ্যতার শর্ত শিথিল করা হবে না।
- (3) উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নে সর্ব প্রকার যত্ন ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- (4) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চার বছরের সমন্বিত ডিগ্রি কোর্স ও এক বছরের মাস্টার্স কোর্স পড়ানো হবে। অন্যদিকে সাধারণ কলেজগুলোতে তিন বছরের সমন্বিত ডিগ্রি কোর্স পড়ানোর প্রসঙ্গ করা হচ্ছে। যে সকল কলেজে চার বছরের ডিগ্রি কোর্স এবং এক ও দুই বছরের মাস্টার্স পড়ানো হবে সেই সকল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ বলা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলো জেলা সদরে অবস্থিত হবে। সাধারণ কলেজ পর্যায়ে তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু থাকবে। মেধার ভিত্তিতে বাছাইয়ের পর তাদের জন্য দুই বছরের মাস্টার্স কোর্স পড়ার সুযোগ থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের পাঠ্যসচি হবে এক ও অভিন্ন।
- (5) যে সকল কলেজ উন্নত সে সকল কলেজে চার বছরের ডিগ্রি কোর্স পড়ানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। চার ও তিন বছর কোর্স পর্যায়ে ১০০ নম্বরের ইংরেজি ভাষা বিষয় সকল ছাত্রছাত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক হবে।
- (6) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাধারণ এমফিল কোর্স দু বছরের হবে। সর্বমোট তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে পিএইচডি কোর্স শেষ করতে হবে।
- (7) গবেষণার কাজে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে একযোগে অংশগ্রহণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মৌলিক গবেষণার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী ছাত্রদের গবেষণার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট সংখ্যক উচ্চমূল্যের গবেষণা ও ফেলোশিপের ব্যবস্থা করতে হবে। সংগে সংগে ডিগ্রি কলেজগুলোতে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে।
- (8) উচ্চ শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসচি হবে আধুনিক ও আন্তর্জাতিকমানের। শিক্ষার সর্বস্বরে মাতৃভাষা প্রচলনের কোন বিকল্প নেই এবং সেই কারণেই ইংরেজিসহ অন্যান্য ভাষায় রচিত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যবহারযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ রচনা বাংলা ভাষায় ভাষান্তর হওয়া প্রয়োজন। এই কাজকে জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ গণ্য করে ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী। তবে বাংলা ভাষায় বই, সাময়িকী অনুবাদ করা এখনও পর্যাপ্তভাবে হচ্ছে না। তাই সাময়িকভাবে হলেও প্রয়োজনবোধে ইংরেজি মাধ্যম চালু রাখা যেতে পারে।
- (9) উচ্চ শিক্ষার আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার জন্য শিক্ষাখাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করতে হবে। সরকারি অনুদান ছাড়াও শিক্ষার্থীর বেতন, ব্যাংক খণ বা ব্যক্তিগত অনুদানের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। তাছাড়া মেধা ও অভিত্বাবকের আর্থিক সচ্ছলতার নিরিখে শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃত্তি প্রদান করা হবে। বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে ভর্তি ফি ও বেতন খুবই সামান্য। অভিত্বাবকের আর্থিক সচ্ছলতার প্রত্যয়ন পত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বেতন নির্ধারণ করা হবে। এতে অসচ্ছল অভিত্বাবক ও ছাত্র ছাত্রীরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে। সংগে সংগে শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষকদেরকেও সশেষজনক বেতন ভাতাদি প্রদান কার ব্যবস্থা করতে হবে।
- (10) বাংলাদেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি অনুমোদনকারী ও পাঠদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। প্রয়োজনবোধে এর একাধিক শাখা থাকতে পারে।
- (11) উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসচি ও শিক্ষার মান সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সমমানের হতে হবে। টেলিভিশনে সুবিধাজনক কোন চ্যানেল-যেমন দ্বিতীয় চ্যানেলে অধিকতর সময়, রেডিও ট্রান্সমিশন, মাল্টি ইনফরমেশন সিস্টেম, ইন্টারনেট সিস্টেম এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চালু করা একান্তপ্রয়োজন।
- (12) বাংলাদেশের বিকাশমান অর্থনীতিতে বস্তু ও চামড়া খাতের বিপুল গুরুত্ব ও সম্ভাবনার কথা বিবেচনায় রেখে টেক্সটাইল কলেজ ও কলেজ অব লেদার টেকনোলজিকে অধিকতর শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

- (13) প্রত্যেক কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে।
- (14) দেশের উচ্চ শিক্ষার স্বার্থে অনুমোদিত ও প্রস্তুত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী ও শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমানের হতে হবে। এই সব বিশ্ববিদ্যালয় কোনভাবেই সাম্প্রদায়িক ও বাণিজ্যভিত্তিক হতে পারবে না, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরোধী হতে পারবে না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্মকান্ড, কর্মপরিধি পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে দেখার জন্য একটি অপব্যবহারের হ্রাস দৃষ্টিপত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যুগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯২ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পরিমার্জন করতে হবে।
- (15) বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এ দেশে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন ও নেতৃত্ব প্রদান করবে। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার মান যাতে একটি মর্যাদাপূর্ণ আসনে স্থিত হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য পরিকল্পনা প্রশয়ন, উন্নয়ন এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন এই কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব বলে বিবেচিত হবে। সকল বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ তাদের শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় উন্নয়ন প্রকল্প, নতুন বিভাগ খোলা, বর্তমান বিভাগের সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সংগে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত নেবে।

### প্রকৌশল শিক্ষা:

বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। বর্তমানে উন্নত দেশগুলোতে বটেই, আমাদের সমাজেও সাধারণ মানুষের জীবনে সকল ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞান এবং তার প্রয়োগ হয়ে পড়েছে একান্ত অপরিহার্য। এর ফলে সামাজিক জীবনযাত্রার পট পরিবর্তন হচ্ছে এবং সমাজ জীবনের কার্যধারাতেও আসছে গতিশীল পরিবর্তন। একবিংশ শতাব্দীতে প্রকৌশল বিষয়ের শিক্ষাক্রম অনেক বদলে যাবে। প্রকৌশল ও কারিগরি শিক্ষার লক্ষ্য হবে সমাজে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসমৃদ্ধ, বাস্তবধর্মী দক্ষ প্রকৌশল ও কারিগরি জনশক্তি গড়ে তোলা-যারা দেশের উন্নয়নে, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে, দারিদ্র বিমোচনে এবং সমাজ ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে অবদান রাখবে।

### সুপারিশ:

- (1) বর্তমানের প্রযুক্তি ও পরিবর্তিত আর্থ সামাজিক পরিবেশ, উন্নয়ন, উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে দেশ ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ প্রকৌশলী সরবরাহ করার জন্য প্রকৌশল বিদ্যালয়গুলোতে আসন সংখ্যা বর্ধিত করতে হবে।
- (2) প্রকৌশল শিক্ষাক্রমের অধিকাংশ বইপুস্তকই ইংরেজিতে। এজন্য প্রকৌশল শিক্ষায় আগ্রহী ছাত্রদের ইংরেজির ভিত মাধ্যমিক স্তর থেকেই মজবুত করতে হবে।
- (3) দেশের সম্পদ উন্নয়ন ও বিভিন্ন কারিগরি সমস্যার সমাধান ও উচ্চ মানসমৃদ্ধ প্রকৌশলী তৈরির জন্য বুয়েটে গবেষণা ও স্নাতকোত্তর কোর্সের প্রতি অধিকতর নজর দেওয়া প্রয়োজন। বিআইটিগুলোতে পর্যায়ক্রমে স্নাতকোত্তর কোর্স জোরদার করা হবে। গবেষণার মূল এলাকাগুলো হবে দেশীয় প্রকৌশল শিল্পের সমস্যা বিষয়ক। পেশায় নিযুক্ত স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী প্রকৌশলীদের জন্য বাড়তি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন।

- (4) দেশের বৃহৎ শিল্পগুলোতে প্রকৌশল, রসায়ন, বস্ত্র, পাট, চামড়া, সিরামিক ও গ্যাস শিল্পের জন্য উপযুক্ত প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদ তৈরীর জন্য অবিলম্বে বিকাশমান বিষয়ে কোর্স চালুসহ, বিআইটি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন নতুন ফ্যাকাল্টি চালু করা বাঞ্ছনীয়। এই লক্ষ্যে বিআইটিগুলোকে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা দরকার।
- (5) প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যার কোর্সগুলোকে অধিকতর ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির নিয়মিত হালনাগাদসহ শিল্প কারখানা ও কারিগরি সংস্থাসমূহে শিক্ষার্থীদের সহায়ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- (6) প্রকৌশল শিক্ষায়তনের সংগে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও শিল্প সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই ক্ষেত্রে নবিশি শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে গবেষণা চালুসহ দেশের সকল পর্যায়ের চেম্বার অব কমার্স এবং চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিগুলোর প্রকৌশল শিক্ষায়তনের সংগে সহযোগিতা করার জন্য যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।
- (7) প্রকৌশল শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রশয়নের সময়ে অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ের উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন।
- (8) বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জীবনচক্র ছোট হয়ে যাওয়ায় এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হওয়ায় চাকরিতে নিয়োজিত পেশাজীবী প্রকৌশলীদের অব্যাহত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং অব্যাহত পেশাগত উন্নয়নের ব্যবস্থা ব্যাপকহারে চালু করা উচিত।
- (9) ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী দেশের প্রকৌশল বিদ্যায়তন ইনস্টিটিউটগুলোতে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে।
- (10) দেশের প্রচলিত বিভিন্ন স্তরে কারিগরি ও প্রকৌশল শিক্ষার মন্যায়ন, মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতে পেশাগত ও বিশেষজ্ঞ সংস্থার মন্যায়ন ও স্বীকৃতিদানের ব্যবস্থা করা দরকার।
- (11) প্রকৌশল ক্ষেত্রে গবেষণা বিষয়ে সরকারের দিক নির্দেশনা প্রদানসহ সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও অর্থায়নের জন্য সংযুক্ত স্থান বা দফতর হিসেবে একটি ইনজিনিয়ারিং রিসার্চ কাউন্সিল গঠন করা আবশ্যিক।
- (12) বিআইটি, টেক্সটাইল ইনজিনিয়ারিং কলেজ, টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ব্যবস্থাপনা এবং এগুলোর শিক্ষার মান উন্নত করা একান্ত প্রয়োজন। লেদার টেকনোলজি ইনস্টিটিউট সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। এই উদ্দেশ্যে তাদের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনসহ শিক্ষকদের উচ্চতর ডিগ্রি প্রদানের লক্ষ্যে নিয়মিত বুয়েটে ও বিদেশে শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

## চিকিৎসা, সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষাঃ

দেশের সমস্ত অধিবাসীকে সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবনদানের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত মানের চিকিৎসক, সেবক, সেবিকা, স্বাস্থ্যকর্মী ও সকল প্রকারের বিশেষজ্ঞ তৈরি করাই চিকিৎসা, সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যে। তাই দেশের ব্যাধি ও চিকিৎসা সমস্যাবলির মোকাবেলায় উপযুক্ত চিকিৎসা শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ তৈরি করা প্রয়োজন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুফল দেশের জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য চিকিৎসা, সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার সম্প্রসারণ আবশ্যিক।

## সুপারিশঃ

- (1) মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য পরীক্ষা নিতে হবে।
- (2) কোন প্রার্থী দুই বছরের বেশি ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে না।
- (3) মেডিকেল কলেজে পাঁচ বছরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসচি অব্যাহত থাকবে এবং এক বছরের ইন্টারশীপ থাকবে।
- (4) মেডিকেল শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি থাকা দরকার।
- (5) স্নাতকোত্তর চিকিৎসার সম্ভ্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য অধিক সংখ্যক চিকিৎসা-শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ তৈরি করা প্রয়োজন।
- (6) মেডিকেল কলেজগুলো স্নায়তশাসিত হবে এবং সমস্ত কার্যক্রম একটি চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।
- (7) মেডিকেল কলেজ শিক্ষকদের চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের বয়স ষাট বছর হওয়া উচিত।
- (8) নাসিং কলেজে এমএসসি নাসিং কোর্স খোলার উদ্যোগ নিতে হবে।
- (9) নাসিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে অবশ্যই কোন হাসপাতালের ব্যবস্থাপনার সংগে যুক্ত থাকতে হবে।
- (10) প্যারামেডিকেল শিক্ষায় ভর্তি যোগ্যতা ন্যূনতম এসএসসি হওয়া উচিত।
- (11) মেডিকেল কলেজগুলোর শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসচি ও প্রশাসনিক বিষয়ে মতবিনিময়ের জন্য একটি আনঃমেডিকেল কলেজ বোর্ড গঠিত হওয়া উচিত।
- (12) আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার পাশাপাশি ঐতিহ্যগতভাবে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত হোমিওপ্যাথি, ইউনানি এবং আয়ুর্বেদী চিকিৎসা ব্যবস্থারও উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

## বিজ্ঞান শিক্ষাঃ

বিজ্ঞানের মূল কাজ হচ্ছে প্রকৃতির নিয়মগুলো ক্রমাগত শুদ্ধতর রূপে জানা ও তার প্রয়োগে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করা। ক্রমাগত নতুন উদ্ভাবন, আবিষ্কার, সংযোজন, সংশোধন ও রূপান্তরের ভেতর দিয়ে বিশুদ্ধে বিজ্ঞানের জ্ঞান বিকাশ লাভ করেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির মূলে কাজ করেছে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, পরিমাপন, তত্ত্বনির্মাণ, বিশেষণ ও গাণিতিক যুক্তিপ্রয়োগ এবং সমগ্র তথ্য ও তত্ত্বের মধ্যে সমন্বয়সাধন। বিজ্ঞানের গতিশীলতা, পরিবর্তনীয়তা ও সৃজনশীলতা বিজ্ঞান শিক্ষার ধারায় সুনিশ্চিত করতে হবে।

বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীদের এমনভাবে প্রস্তুত করা যেন তারা প্রতিভাবিকাশ, জ্ঞানের সাধনা ও সৃষ্টিশীলতায় আনঃর্গাতিক মান অর্জন করতে পারে। বিজ্ঞানের সংগে প্রযুক্তি শিক্ষা ও মানবিক শিক্ষার যে পারস্পরিকতা ও

পরিপক্বতা তা উপলব্ধি করে একটি সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থার অংশরূপে বিজ্ঞান শিক্ষা কাজ করবে। বিজ্ঞান শিক্ষার মঙ্গল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের সমাপ্রিক উন্নতি ত্বরান্বিত করা। শিক্ষার সব স্তরেই বিজ্ঞান শিক্ষা উক্ত উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হবে।

### সুপারিশঃ

- (1) বিজ্ঞান শিক্ষা প্রাথমিক স্তর থেকেই শুরু হবে। শিশুদের বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে প্রকৃতির ঘটনামালা ও সহজ নিয়মগুলোর সংগে পরিচিত করে।
- (2) শিক্ষার্থীর স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ও প্রশ্ন করার প্রবণতাকে শিক্ষক সঠিক তথ্য প্রদান করে উৎসাহিত করবেন।
- (3) প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনে বিজ্ঞান একটি সৃজনশীল, সক্রিয় ও আনন্দপূর্ণ কর্মধারা-এই সত্যটি যাতে বিজ্ঞান শিক্ষার্থী লাভ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।
- (4) প্রাথমিক স্তর প্রকৃতি, পরিবেশ ও পারিশার্ভিক ঘটনাবলি সম্বন্ধে শিশুরা যাতে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে সেজন্য নানা চিত্র প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও নানা সহজ পরীক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- (5) বিজ্ঞানের বইয়ে যথাসম্ভব আধুনিকতম আবিষ্কারের ঘটনা ও দৃষ্টান্তসহজভাবে উপস্থাপিত হবে।
- (6) প্রাথমিক স্তরের দ্বিতীয় ভাগে (ষষ্ঠ, সপ্তম, ও অষ্টম শ্রেণী) বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার একটি সমন্বিত কোর্স থাকবে।
- (7) মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে উপলব্ধি ও বিশেষণের ক্ষমতাকে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।
- (8) বিজ্ঞান শিক্ষাদানের প্রতিটি স্তরে বেতার, টেলিভিশন, অডিও-ভিডিও রেকর্ড, কমিউটার নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট ইত্যাদি মাধ্যম ব্যবহার করার যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে।
- (9) মেধাবী ও সৃজনশীল স্নাতকদের শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করতে হবে।
- (10) প্রতিটি শহরে একটি 'বিজ্ঞান কেন্দ্র' গড়ে তুলতে হবে। এছাড়া বিজ্ঞান ক্লাব, বিজ্ঞান পাঠাগার ও ওয়ার্কশপ থাকবে।
- (11) চার বছরের স্নাতক ডিগ্রি প্রাথমিক ডিগ্রিরূপে গণ্য করা হবে, ফলে উচ্চতর স্তর শিক্ষাদান বা গবেষণার কাজে নিযুক্ত হওয়া ভিন্ন অন্য সকল ক্ষেত্রে এই স্নাতক ডিগ্রি পর্যাপ্ত বলে গণ্য করা হবে।
- (12) স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্য গবেষণায় মৌলিক অবদান রাখতে হবে এবং প্রাসংগিক বিষয়ে কোর্সওয়ার্ক করতে হবে। স্নাতকোত্তর ডিগ্রির শিক্ষা যাতে আনুষ্ঠানিক মানের হয় সে লক্ষ্যে যোগ্য শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা ও গবেষণা পরিচালিত হতে হবে।
- (13) গবেষণার জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে এবং গবেষকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।
- (14) পরীক্ষাগার ও গবেষণাগার উন্নয়নের জন্য ইকুইপমেন্ট বোর্ড পুনঃস্থাপন করতে হবে। গবেষণার জন্য উন্নত আনুষ্ঠানিক মানের কেন্দ্রীয় গবেষণাগার গড়ে তুলতে হবে।

- (15) বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রের পাঠাগারের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করতে হবে। আধুনিক ইলেকট্রনিক্স মেইল ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ গবেষণার কাজে ব্যবহারের অগ্রগণ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।
- (16) গবেষণার ফল সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিষয়ভিত্তিক জাতীয় গবেষণা জার্নাল প্রকাশ করতে হবে। বিদেশী ও খাণ ও সাহায্য গ্রহণের একটি নির্দিষ্ট অংশ বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার জন্য নির্ধারিত থাকতে হবে।
- (17) শিক্ষক ও গবেষক নিয়োগের ক্ষেত্রে গবেষণায় অভিজ্ঞতা গবেষণানির্ভর উচ্চ ডিগ্রি যথা এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রিপ্ৰাপ্তদের অধিক গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- (18) আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রযুক্তির ব্যবহার এবং শিক্ষাদানের কৌশল ও দক্ষতা অর্জনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের খন্ডকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশন অথবা বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব আয়োজনে এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।
- (19) বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণাকে দেশের উন্নয়ন ও শিল্পায়নের সংগে সার্থকভাবে সম্পর্কিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে। যৌথ গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ, মতামত ও তথ্য বিনিময় এবং বিশেষজ্ঞদের পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।

### কারবার (বিজনেস) শিক্ষাঃ

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প, বাণিজ্য ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের অবদান অসীম। শিল্প, বাণিজ্য ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের শাখাসমূহের সমন্বিত ব্যবস্থাকে কারবার (বিজনেস) শিক্ষা বলা হয়। এছাড়া কারবার শিক্ষা যথার্থভাবে আয়ত্ত করতে পারলে চাকরির বিকল্প হিসেবে ব্যবসাকে আত্মকর্মসংস্থানের জীবিকার উপায় হিসেবে গ্রহণ করা যায়। বর্তমান বিশ্বে বাজার অর্থনীতির প্রচলন, বিশ্ববিস্তৃত পণ্যের বাজার এবং তীব্র প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও তার সহায়ক কার্যাবলি প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যের অন্যতম পর্ষশর্ত হিসেবে পরিগণিত। তাই পৃথিবীর সকল দেশেই কারবার শিক্ষার গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কারবার শিক্ষার মূল লক্ষ্য কারবার শিক্ষা ও জগত সম্পর্ক প্রাথমিক ধারণা দেওয়া, আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা করা, প্রতিষ্ঠানের আকারভেদে সাংগঠনিক স্তরের নিম্ন বা মাঝারি পর্যায়ের কর্মকর্তা সৃষ্টিতে সহায়তা করা ও মাধ্যমিক স্তর শিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলা। এমবিএ প্রোগ্রামের প্রধান উদ্দেশ্য হবে শিক্ষক, প্রশিক্ষক, পরামর্শক ও গবেষক তৈরিতে সহায়তা করা। পিএইচডি কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য হবে এমবিএ স্তরে শিক্ষাদান ও গবেষণা তত্ত্বাবধানের জন্য শিক্ষকদের নৈপুণ্য বৃদ্ধি করা।

### সুপারিশঃ

- (1) দেশে ও বিদেশে বাংলাদেশের জনবলের চাহিদার ভিত্তিতে কারবার শিক্ষার সম্প্রসারণ, পরিমার্জন ও সমন্বয় সাধন করতে হবে।
- (2) কারবার বিষয়ক শিক্ষার সকল স্তর শিল্প, বাণিজ্য ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত রীতি পদ্ধতি ও সম্ভাব্য উন্নয়ন চাহিদার আলোকে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও পাঠ্যসচি নির্ধারণ করতে হবে।

- (3) কারবার বিষয়ক শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের উদ্দেশ্য অনুযায়ী পাঠ্যসচি প্রশয়ন করতে হবে।
- (4) কারবার শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করতে হবে এবং এজন্য একাধিক কারবার শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করতে হবে।
- (5) মাধ্যমিক স্তর থেকে কারবার শিক্ষা শুরু করতে হবে। মাধ্যমিক স্তর কারবার পরিচিতি, হিসাবশাস্ত্র, বিপণন, কম্পিউটারের ব্যবহার ইত্যাদি সমন্ধে প্রাথমিক ধারণাদিতে হবে।
- (6) মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায়োগিক ক্ষেত্রসমূহ সম্মুখে জানার আগ্রহ সৃষ্টির জন্য বছরে অন্ত একবার তাদের নিকটস্থ কারখানা বা কারবার প্রতিষ্ঠান দেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- (7) ফলপ্রসংশিক্ষাদানের লক্ষ্যে শিক্ষক ছাত্রের বর্তমান অনুপাত কমিয়ে ১ঃ ১৫ করতে হবে।
- (8) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যেক বিভাগে কম্পিউটার ল্যাবরেটরি স্থাপন করা প্রয়োজন। এখানে প্রত্যেক ল্যাব-এ প্রয়োজনীয় সংখ্যক পিসি থাকতে হবে।
- (9) বাণিজ্য অনুষদের শিক্ষকদের শিল্প, ব্যাংক, বীমা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত সমস্যা নিয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- (10) শিক্ষকদের পিএইচডি সংক্রান্ত গবেষণার কাজ পরিচালনায় উৎসাহ প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রেষণামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- (11) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসচি প্রশয়ন কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে মত বিনিময়ের সুযোগ থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসচি প্রশয়ন কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক, ব্যবস্থাপক এবং অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত হতে হবে।
- (12) জাতীয় পর্যায়ে কারবার বিষয়ক শিক্ষার গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় পরিকল্পনায় ও সম্বন্ধ বন্টনে এ খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে গণ্য করতে হবে।

## কৃষি শিক্ষাঃ

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এ দেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। তাই, আর্থসামাজিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন কৃষি উন্নয়ন ও বিকাশের সংগে সম্বন্ধিত। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন কৃষি শিক্ষা, গবেষণা ও সম্বন্ধসারণ ব্যবস্থার সংগে ওতপ্রোতভাবে সম্বন্ধিত। কৃষি একটি ফলিত বিজ্ঞান। কৃষি বলতে বোঝায় দেশের শস্য, পশুসম্বন্ধ, মৎস্য সম্বন্ধ ও বনসম্বন্ধের পরিকল্পিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা। উচ্চতর কৃষি বলতে পরিকল্পিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, কৃষি, ভেটেরিনারি, পশুপালন, কৃষি প্রকৌশল, কৃষি অর্থনীতি, মৎস্য বিজ্ঞানে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও ডক্টরাল পর্যায়ে অধ্যয়ন ও উচ্চতর গবেষণা বোঝায়।

কৃষি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল দেশের পরিবেশগত শক্তি ও সম্ভাবনার অধিক বিকাশ সাধন, জাতীয় উন্নয়নে কৃষি নির্ভর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, বিজ্ঞান ও যান্ত্রিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্বন্ধের সুষ্ঠু ব্যবহার দ্বারা কৃষি সম্বন্ধের যথাযথ বিকাশ, পেশা ও বিজ্ঞান হিসেবে কৃষির গুরুত্ব অনুধাবন, খাদ্যে স্বয়ংসম্বন্ধতা অর্জন, অপুষ্টি দূরীকরণ ও দারিদ্র্য বিমোচন, গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সম্বন্ধসারণ।

## সুপারিশঃ

- (1) বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি কলেজগুলোতে চার বছর মেয়াদি স্নাতক কোর্স পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে।
- (2) স্নাতক পর্যায়ে সকল শিক্ষাক্রমে যুক্তিযুক্ত উপায়ে সংশ্লিষ্ট বাধ্যতামূলক বিষয়, ঐচ্ছিক বিষয়, মাঠ ও গ্রামীণ কর্ম-অভিজ্ঞতা, সমাজবিজ্ঞান, ভাষা ও মৌল বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার অনুপাত হবে ৫০ঃ ৫০।
- (3) কোর্স পদ্ধতি নির্দিষ্ট সময়সীমায় আবদ্ধ বলে এর সার্বিক সাফল্য শিক্ষক বিশেষের জ্ঞান, দক্ষতা, আশ্রয়িতা ও নিবেদিতপ্রাণতার ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। এ কারণে দক্ষ ও মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরিসহ তাঁদের অনুকূলে উৎসাহ বিধানের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং তাঁদের জন্য উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ জ্ঞানের আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া জোরদার করতে হবে।
- (4) কোর্স পদ্ধতিতে উচ্চতর কৃষি শিক্ষাক্রমে শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত হবে ১ঃ১০।
- (5) শিক্ষকদের কর্ম-পরিকৃতির মন্যায়ন প্রথা চালু করতে হবে।
- (6) উচ্চতর কৃষি শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় প্রথম ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা হবে বিজ্ঞান বিভাগে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত ও জীববিদ্যাসহ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। তবে কৃষিবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিদ্যা এবং গণিতসহ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা শুধু কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদে ভর্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।
- (7) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বর্তমানে কৃষি বিজ্ঞানে যে পাঠ দেওয়া হয় তা একজন শিক্ষার্থীর স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য পর্যাপ্ত নয়। এরূপ ক্ষেত্রে, তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভেটেরিনারি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, পশুসমৃদ্ধ ইনস্টিটিউট ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে অধিকতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- (8) বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের সংগে সংগে ডিভিএম এর ক্ষেত্রে দুই সেমিস্টারের জন্য এবং অন্যান্য ডিগ্রির ক্ষেত্রে এক সেমিস্টারের জন্য ইন্টার্নশিপ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- (9) স্নাতক পর্যায়ে যথাসম্ভব মাতৃভাষায় শিক্ষাদান করা হবে এবং এই লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রয়োজনীয় পাঠপুস্তক ও সহায়ক গ্রন্থাদি রচনা ও প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ বিষয়ে বাংলা একাডেমী ভূমিকা রাখতে পারে।
- (10) দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে সকল ছাত্রছাত্রীকে অন্ত দুই ক্রেডিট আওয়ার এর জন্য ইংরেজি ভাষা শিখতে হবে।
- (11) বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন সেমিস্টারব্যাপী কোর্স পদ্ধতি এমএস কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে এবং অন্যান্য তিন বছর মেয়াদি ডক্টরাল কার্যক্রমে গবেষণা ছাড়াও কোর্স প্রথা প্রবর্তন করতে হবে।
- (12) কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বনবিজ্ঞান অনুষদ খুলে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স এবং গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স প্রবর্তনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- (13) কম্পিউটার বিজ্ঞান শিক্ষা স্নাতক পর্যায়ে সবার জন্য বাধ্যতামূলক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ঐচ্ছিক করতে হবে।
- (14) বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও জাতীয় উন্নয়ন চাহিদার সংগে উচ্চতর কৃষিশিক্ষাকে সংগতিপূর্ণ করে তোলার জন্য প্রচলিত সংশ্লিষ্ট কোর্সসমূহের পাশাপাশি নতুন নতুন কোর্স সংযোজনের ব্যবস্থা করতে হবে। (যেমন পরিবেশ বিজ্ঞান,

জৈবপ্রযুক্তি, জেনেটিক ইনজিনিয়ারিং, সম্ভ্রুদ অর্থনীতি, জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা, ভূমিস্বত্ব ও ব্যবস্থাপনা, পুষ্টিবিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান প্রভৃতি।

- (15) উচ্চতর শিক্ষার মান ও সমরূপতা বজায় রাখার জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি সমন্বয়, মন্যায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করতে হবে।

## ললিতকলা শিক্ষাঃ

একটি সংস্কৃতিবান, সুরচিসম্ভ্রুদ, ঐতিহাসচেতন সুশৃংখল জাতি ও নাগরিকগোষ্ঠী সৃষ্টির জন্য ললিতকলা শিক্ষাদান অত্যন্ত জরুরী। ললিতকলার অন্তর্গত সংগীত, চিত্রকলা, কারুশিল্প ও নানাবিধ হাতের কাজ, আবৃত্তি, অভিনয়, নৃত্য ইত্যাদি বিষয় শিক্ষার্থীর মন ও মননকে বিকশিত করে, চিত্রবৃত্তিকে সমৃদ্ধ করে। ললিতকলা শিক্ষা শিক্ষার্থীর মনের সুকুমার বৃত্তিকে জাগ্রত করে, মন ও কর্মে শৃংখলাবোধ সৃষ্টি করে, তাই পরিমিতিজ্ঞানসম্ভ্রুদ, দক্ষ এবং সুনাগরিক জনগোষ্ঠী সৃষ্টিতে ললিতকলা শিক্ষা আবশ্যিক। দেশের চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সংগীত, নাটক, যাত্রা ও থিয়েটার ইত্যাদি সম্ভ্রুদক যেমন এর মাধ্যমে ধারণা লাভ করা যায়, তেমনি বিভিন্ন দেশের শিল্প সংস্কৃতি সম্ভ্রুদক জ্ঞান লাভ করা যায়। ললিতকলার যে কোন একটি বা একাধিক শাখায় শিক্ষালাভ করে পেশাজীবী গোষ্ঠী সৃষ্টি করা যায়। ললিতকলা শিক্ষার ফলে বৃত্তিমঙ্গক শিক্ষার ন্যায় বিদ্যালয়ত্যাগী শিক্ষার্থীদের আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করা যায়।

## সুপারিশঃ

- (1) ললিতকলা বিষয়টি সাধারণ শিক্ষায় প্রাথমিক স্তর আবশ্যিক ও মাধ্যমিক স্তর ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে প্রবর্তন করতে হবে।
- (2) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ললিতকলা শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক, উপযুক্ত কক্ষ ও পরিবেশ সংস্থান করতে হবে।
- (3) সরকারি উদ্যোগে ও অর্থানুকূলে জাতীয় চিত্রশালা, সংগীত ও নৃত্য একাডেমি ও রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- (4) সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে শহর ও গ্রাম পর্যায়ে ভ্রাম্যমাণ চিত্রকলা ও কারুশিল্পের প্রদর্শনী, সংগীত, নাটক ও নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- (5) ললিতকলা শিক্ষা বিষয়টিকে একটা পেশাভিত্তিক শিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

## আইন শিক্ষাঃ

দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা ও দায়িত্বশীল নাগরিক সৃষ্টির জন্য আইন শিক্ষার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। দেশে ন্যায়বিচার, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যের জন্যও আইন সম্ভ্রুদক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আইন শিক্ষার দুটি দিক রয়েছে-পেশাগত ও ব্যবহারিক। দেশের প্রচলিত আইন শিক্ষায় এ দুটি দিকের কোনটারই সুষ্ঠু বিকাশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। আইন শিক্ষার মান যেমন নানা কারণে নিম্নমুখী হচ্ছে তেমনি ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও এর কল্যাণকর ফলাফল সব সময় লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তাই আইন শিক্ষার সার্বিক পুনর্বিদ্যাস ও আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা আইন সম্ভ্রুদক যেন আরও আগ্রহী, সচেতন এবং কল্যাণকর দিক সম্ভ্রুদক জ্ঞানী হয় সে বিষয়েও আইন শিক্ষাকে

অধিকতর প্রয়োগমুখী করতে হবে। তাই দেশের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে প্রচলিত আইন শিক্ষার আশু সংস্কার সাধন করতে হবে।

### সুপারিশঃ

- (1) আইন শিক্ষার মানোন্নয়নকল্পে এলএলবি কোর্সের মেয়াদ দু বছরের পরিবর্তে তিন বছর হওয়া উচিত।
- (2) আইন শিক্ষায় ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা হিসেবে মাধ্যমিক ও ডিগ্রি পরীক্ষায় কমপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগ থাকা উচিত।
- (3) আইন শিক্ষার ব্যবহারিক দিকের সংগে যথাযথ পরিচয় বিধান ও এ বিষয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কলেজগুলোতে এলএলবি কোর্সটিকে দু'ভাগে বিভক্ত করা উচিত। প্রথম অংশের প্রথম বর্ষ সমাপ্তির পর এলএলবি প্রথম বর্ষ পরীক্ষা হবে। এ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় বর্ষে প্রমোশন পাবে। প্রথম দু' বছর আইনের ইতিহাস, মৌলিক বিষয়সমূহ ও সূত্রপাঠে ব্যয়িত হবে। তৃতীয় বর্ষে দলিল প্রশয়ন, সওয়াল জওয়াব, আর্জি-মুসাবিদা, মামলা পরিচালনা বিধি ইত্যাদি ব্যবহারিক বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করবে। এছাড়া মামলার ইতিহাস লেখা, মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রস্তুত, পেশাগত নৈতিকতা ও দায়িত্ব এবং খবমধষ ডংরংরহম ধহফৎবধৎপয এবং মুট কোর্ট এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। একইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের চার বছর মেয়াদি অনার্স কোর্সের চতুর্থ বছরে ব্যবহারিক বিষয়সমূহে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
- (4) আইন শিক্ষার পাঠ্যসচি ও পরীক্ষা পদ্ধতিকে যুগোপযোগী করে তোলা প্রয়োজন। আইন শিক্ষার মান নিশ্চিত করার জন্য পাস মার্ক ৪৫ হওয়া উচিত এবং তৃতীয় শ্রেণীর ডিগ্রি থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। আইন শিক্ষার জন্য ইংরেজি ভাষার বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনা করে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের এলএলবি কোর্সে ইংরেজি ভাষার ওপর একটি পর্নপত্র চালু করা প্রয়োজন।
- (5) আইন শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রি ও গবেষণা উৎসাহিত করার লক্ষ্যে যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে এলএলবি অনার্স, এলএলএম/এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি করার সুযোগ নেই, সেখানে তা অবিলম্বে ব্যবস্থা করা উচিত।
- (6) আইন শিক্ষায় মাস্টার্স ডিগ্রি কোর্সের মেয়াদ হবে দু বছরের। মাস্টার্স ডিগ্রি কোর্স দু'ভাগে বিভক্ত হবে। যারা প্রথম অংশে কোর্স কার্যক্রম ও দ্বিতীয় অংশে থিসিস কার্যক্রমে যোগদান করে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবে তাদের এমফিল ডিগ্রি প্রদান করা হবে। পিএইচডি ডিগ্রির ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধিসমূহ এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
- (7) উচ্চতর গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির জন্য 'বাংলাদেশ লিগ্যাল ইনস্টিটিউট' নামে একটি স্নাতকোত্তর ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যিক। মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের দেশে ও বিদেশে গবেষণার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।
- (8) আইন শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য আইন কলেজগুলোর ভৌত সুবিধা, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে।
- (9) আইন কলেজ অনুমোদনের ব্যাপারে কলেজ ভবন, পাঠাগার, শিক্ষক নিয়োগ, কলেজের প্রশাসন, পরিচালনা ও গভর্নিং বডি গঠন ইত্যাদি ব্যাপারে সাধারণ কলেজসমূহের ক্ষেত্রে আরোপিত শর্তাদি আইন কলেজের ক্ষেত্রেও কঠোরভাবে প্রয়োগ ও বলবৎ করতে হবে।
- (10) বর্তমানে আইন কলেজসমূহে খন্ডকালীন শিক্ষক ও খন্ডকালীন ছাত্রছাত্রী এবং সাক্ষ্যকালীন কোর্স ও ক্লাস সব মিলিয়ে দ্বৈত খন্ডকালীন শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তার অবসান দরকার। তাই নিয়ম ও নীতি হিসেবে পর্যায়ক্রমে আইন কলেজগুলোতে এলএলবি কোর্সকে Full time day course -এ রূপান্তরিত করা দরকার। ব্যতিক্রম হিসেবে, প্রয়োজনীয় শর্ত সাপেক্ষে কিছু প্রতিষ্ঠিত কলেজে নৈশ বা সাক্ষ্যকালীন ব্যবস্থা থাকতে পারে।

- (11) আইন কলেজগুলোতে মোট শিক্ষকের দুই-তৃতীয়াংশ নিয়মিত ও পূর্ণ কালীন এবং অনাধিক এক তৃতীয়াংশ খন্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা আবশ্যিক।
- (12) অন্যান্য পেশাগত শিক্ষার ন্যায় আইন শিক্ষার জন্যও দেশের বিভিন্ন স্থানে অন্তত প্রতিটি বৃহত্তর জেলায় একটি করে সরকারি মডেল আইন কলেজ স্থাপন করতে হবে এবং আইন কলেজগুলোতেও অন্যান্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় অনুদান মঞ্জুর করা উচিত।
- (13) মাধ্যমিক ও প্রথম ডিগ্রি পর্যায়ে অন্যান্য ঐচ্ছিক বিষয়ের ন্যায় আইনকেও একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও বৃত্তিমূলক ইত্যাদি শাখায় প্রবর্তন করা যায়।

## নারী শিক্ষাঃ

দেশ ও সমাজ উন্নয়নের মূল ভিত্তি শিক্ষা। সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক নানা কারণে এ দেশের দরিদ্র মানুষ যেমন বঞ্চিত হচ্ছে তেমনি সর্বস্বল্পে ব্যাপক সংখ্যক নারীও এই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক কুসংস্কার, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে সর্বদা নারীকে ঘিরে রাখা হয়েছে। নারী শিক্ষাকে শুধু পরিবারের মঙ্গল, শিশু যত্নের ও ঘরকন্নার কাজে সীমাবদ্ধ রেখে দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক জাতীয় উন্নয়নে নিষ্ক্রিয় রাখার পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রবণতা দূর করতে হবে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীও অসামান্য অবদান রেখেছে। স্বাধীনতার পর থেকে নারী আত্মনির্ভরশীল, জাতীয় উৎপাদনে অংশগ্রহণ, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় তারা সচেতন হয়ে উঠে। তাই নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

নারী শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, আর্থসামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, দরিদ্র বিমোচন, সুন্দর স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবার গঠন, যৌতুক ও নারী নির্যাতন নিরোধ করা।

## সুপারিশ

- (1) অধিক সংখ্যক মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় আনতে হলে স্কুলে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে।
- (2) প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে পাঠ্যসচিত্রে যথার্থ পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীর ইতিবাচক ও প্রগতিশীল ভাবমর্তি ও সমান অধিকারের কথা তুলে ধরতে হবে এবং ইতিবাচক দিকগুলো পাঠ্যসচিত্রে আনতে হবে, যাতে নারীর প্রতি সামাজিক আচরণের পরিবর্তন হয়।
- (3) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসচিত্রে আরও অধিক সংখ্যক মহীয়সী নারীর জীবনী ও নারীদের রচিত লেখা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- (4) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করার সরকারি সিদ্ধান্ত অবিলম্বে বাস্তবায়ন প্রয়োজন এবং সেই লক্ষ্যে যতদিন পর্যন্ত মহিলা শিক্ষকের সরকারি কোটা পূরণ না হবে ততদিন পর্যন্ত শুধুমাত্র মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

- (5) মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের বিষয় নির্বাচনে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সকলের পুরো স্বাধীনতা থাকতে হবে এবং সকল বিষয়ের ওপর সমান গুরুত্ব দিতে হবে।
- (6) দেশে মেয়েদের জন্য একটি মাত্র পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের ভর্তির সময় পছন্দ থাকবে যাতে পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষায় আগ্রহী না হলে কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তাই মেয়েদের জন্য পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আরও বাড়াতে হবে।
- (7) মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম হওয়াতে ছাত্রীদের শিক্ষার সুবিধার্থে যাতায়াত সুবিধা ও হোস্টেলের ব্যবস্থা করতে হবে।
- (8) মেয়েদের বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। নারী শিক্ষার হার বাড়াতে হবে এবং মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য শিক্ষা খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।
- (9) স্নাতক পর্যায়ে ফেমিনিস্ট তত্ত্ব শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে 'ওমেন্স স্টাডিজ' নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে আলাদা বিভাগ করা যেতে পারে।
- (10) নারী শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করতে হবে এবং বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- (11) খন্দকালীন, বৃত্তিমূলক এবং নারী শিক্ষার বিষয়ে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার প্রতি বেশি নজর দিতে হবে।
- (12) শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সকল নীতি নির্ধারণী ও সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে মন্ত্রণালয় থেকে উচ্চ শিক্ষা, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- (13) ছাত্রীদের বিদ্যালয় ত্যাগের হার কমানো এবং এসব বারে পড়া ছাত্রীদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কর্মসূচির আওতায় আনতে হবে।
- (14) উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণা করার জন্য দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা এবং স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

### বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, সামরিক বিজ্ঞান শিক্ষা, স্কাউট ও গার্ল গাইড শিক্ষাঃ

যেসব শিশু শারীরিক ও মানসিক সমস্যার জন্য তাদের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা পূরণ করতে পারে না তাদের জন্য দরকার বিশেষ শিক্ষা, দক্ষ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা, বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যা। বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধীদের জন্য দেশে বিশেষ বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। দেশে স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা অবহেলিত। অথচ সুস্থ-জীবন যাপনের জন্য এর অপরিহার্যতা সশঙ্কক সন্দেহের অবকাশ নেই। শিক্ষার্থীর জীবনে সামরিক বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব অনেক। দেশে এর কিছু সুযোগ সুবিধা রয়েছে। স্কাউটিং ও গাইডিং শিশু কিশোরদের মন মানসিকতা গঠনে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

### সুপারিশঃ

### বিশেষ শিক্ষাঃ

- (1) দেশের প্রতিবন্ধীদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য সনাত্তকরণ ও জরিপ চালাতে হবে।
- (2) প্রতিবন্ধীদের জন্য সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে।
- (3) প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করতে হবে।
- (4) প্রতিবন্ধীদের বিশেষ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনবোধে পৃথক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে।
- (5) চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্য প্রতিবন্ধীদের সমান সুযোগ প্রদান করতে হবে।
- (6) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করতে হবে।
- (7) প্রতিবন্ধীদের জন্য কার্যক্রম সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের আওতায় না রেখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় আনতে হবে।

### স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষাঃ

- (8) শরীরচর্চা ও খেলাধুলা পাঠ্যসচিত্রে আবশ্যিক বলে বিবেচিত হবে।
- (9) শরীরচর্চা বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।
- (10) নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনের সময় খেলার মাঠ থাকা একটি অপরিহার্য শর্ত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- (11) স্বল্পমূল্যে স্কুল কলেজে ক্রীড়া সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে।
- (12) দেশীয় খেলাধুলার প্রচলন করতে হবে।
- (13) শারীরিক শিক্ষার জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

### সামরিক বিজ্ঞান শিক্ষাঃ

- (14) দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএনসিসি-র শাখা খুলতে হবে।
- (15) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক বিজ্ঞান বিষয়কে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে খুলতে হবে।
- (16) পাবলিক পরীক্ষার পর অলস সময়ে শিক্ষার্থীদের জন্য স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ শিবিরে সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

### স্কাউটঃ

- (17) দেশের সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউটিং চালু করতে হবে।
- (18) স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসচিত্রে স্কাউটিংকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- (19) মেয়েদের জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গার্ল গাইডিং চালু করতে হবে।
- (20) স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসচিত্রে গার্ল গাইডকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(21) শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে গার্ল গাইড বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

## গ্রন্থাগার বিজ্ঞান

গ্রন্থাগার হল সভ্যতার দর্পণ। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রন্থাগার যেমন একটি দেশের সার্বিক সাংস্কৃতিক বিকাশগত মান নির্ধারণের অন্যতম সচক, তেমনি গ্রন্থাগার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হৃৎপিণ্ড স্বরূপ। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার পরিবেশ ও এর গুণগত মান ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রাণ স্ফুটনের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা দেশের নাগরিকদের জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ, গবেষণা, নীতি ও পরিকল্পনা প্রশয়ন ও শিক্ষা গ্রহণে গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমন্বয়ের মাধ্যমে জ্ঞান ও তথ্য সহজলভ্য করার দায়িত্ব হল দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রগুলোর, এই প্রত্যয়কে ভিত্তি করে দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

## সুপারিশঃ

- (1) সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার স্থাপন বর্তমানে সাধ্যাতীত। তাই দেশের প্রত্যেকটি থানা সদরে গণগ্রন্থাগার স্থাপন করতে হবে, যার প্রধান দায়িত্ব হবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বই পরিবেশন করা। প্রত্যেক ইউনিয়নে এক বা একাধিক নির্বাচিত প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ভ্রাম্যমাণ বইয়ের কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করতে হবে।
- (2) পিটিআই, নেপ এবং অধিদপ্তরসমূহের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারগুলোর আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- (3) গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন কাঠামো যুগোপযোগী করতে হবে।
- (4) মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজে উন্নত ও আধুনিক মানের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সরকার কর্তৃক গ্রন্থাগারের জন্য বার্ষিক মঞ্জুরি দিতে হবে।
- (5) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গ্রন্থাগারকে তথ্যপ্রযুক্তি দিয়ে সমৃদ্ধ করতে হবে।
- (6) গবেষণা কাজে সহায়তার জন্য গ্রন্থ ও সাময়িকী ক্রয়ের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি করতে হবে।
- (7) বিভাগীয় শহর, জেলা এবং প্রত্যেক থানা ও ইউনিয়নে পর্যায়ক্রমে গণগ্রন্থাগার স্থাপন করতে হবে। স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ শহরগুলোতে নগর গ্রন্থাগার ও পৌর গ্রন্থাগার স্থাপন করবে।
- (8) জাতীয় গ্রন্থাগার ও জাতীয় আর্কাইভসের গুরুত্ব বিবেচনা করে এদের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিদ্যায়িত করতে হবে এবং জাতীয় গ্রন্থাগারে একটি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ শাখা থাকবে যা তথ্য প্রযুক্তি দিয়ে সমৃদ্ধ করতে হবে।
- (9) নীতি, পরিকল্পনা ও সমন্বয়গত সমস্যার সমাধান ও উন্নয়নের জন্য একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা (কাউন্সিল) স্থাপন করতে হবে।
- (10) মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরকে নিজ নিজ প্রশাসনাধীন গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রগুলোর উন্নয়ন ও নতুন গ্রন্থাগার স্থাপনায় কাউন্সিলের পরামর্শ অনুযায়ী নীতি ও পরিকল্পনা প্রশয়ন করতে হবে।

## পরীক্ষা ও মন্যায়নঃ

শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পেছনে এক বা একাধিক উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। এই উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জন করা হয়েছে, শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণের কতটুকু বাঞ্ছিত পরিবর্তন হল তা যাচাই করাই পরীক্ষা ও মন্যায়নের কাজ। মন্যায়ন হল একটি বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য অর্জনে কতটা সফল হয়েছে তা নিরূপণ করা।

### সুপারিশঃ

- (1) স্কুল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বর্তমানে প্রচলিত মন্যায়ন পদ্ধতি অব্যাহত থাকতে পারে।
- (2) শিক্ষার্থীর মন্যায়নের জন্য প্রতি বছর সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকতে পারে। পঞ্চম শ্রেণীর শেষে বৃত্তি পরীক্ষা ও অষ্টম শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষা থাকবে।
- (3) প্রাথমিক স্তরের প্রশ্নপত্র প্রশয়ন করবে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং স্কুলগুলোকে সেখান থেকে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
- (4) যে সকল শিক্ষার্থী অষ্টম শ্রেণীর শেষে পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে না, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের একটি কোর্স সমাপ্তি সনদপত্র প্রদান করবে এবং শিক্ষার্থীর অন্তঃপরীক্ষা ও ধারাবাহিক মন্যায়নের ফলাফল জন্ম তারিখসহ উক্ত সনদপত্রে লিপিবদ্ধ থাকবে। পাবলিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে অন্তঃ ও বহিঃ মন্যায়নের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। পরীক্ষার্থীকে অন্তঃ ও বহিঃপরীক্ষায় আলাদাভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে।
- (5) দশম শ্রেণীর শেষে একটি পাবলিক পরীক্ষা থাকবে যার নাম হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা প্রথম পর্ব। মাধ্যমিক স্তরের চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে দ্বাদশ শ্রেণীর শেষে। প্রথম পর্ব পরীক্ষার অকৃতকার্য বিষয়সমূহ দ্বাদশ শ্রেণীর শেষে পরীক্ষা দিতে পারবে। দুই পরীক্ষার ফলাফল একত্র করে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হবে।
- (6) মাধ্যমিক পর্যায়ের পাবলিক পরীক্ষায় এক বিষয়ে অকৃতকার্য হলে তাকে সে বিষয়ে মাত্র একবার পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসি পরিবর্তিত হলে প্লাতন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসি অনুযায়ী উক্ত প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে, তবে কোন অন্তর্ধানকালীন পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যাবে না।
- (7) পরীক্ষার ফলাফল গ্রেডিং পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ণয় করা হবে। পরীক্ষায় কোন মেধা তালিকা থাকবে না।
- (8) প্রত্যেক পাবলিক পরীক্ষায় অন্তঃপরীক্ষা ২০%, বহিঃপরীক্ষা ৮০% (রচনামূলক প্রশ্ন ৩০%, সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ৩০%, নৈর্বািতিক প্রশ্ন ২০%) হিসেবে নম্বর থাকবে। অন্তঃ ও বহিঃ পরীক্ষায় আলাদাভাবে পাশ করতে হবে। অন্তঃপরীক্ষার নম্বর বহিঃ পরীক্ষার নম্বরের আনুপাতিক গড় বা তার কাছাকাছি শতকরা হারে হতে হবে। অন্যথায় অন্তঃপরীক্ষায় কেবল পাশ নম্বর পাবে।
- (9) প্রধান পরীক্ষক, পরীক্ষক ও প্রশ্ন পরিমার্জনাকারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

- (10) পরীক্ষকদের নিকট থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উত্তরপত্র পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে, এবং যথাসময়ে উত্তরপত্র মন্যায়নের ব্যর্থতার জন্য শাস্তি বিধান করতে হবে। উত্তরপত্রের সম্মানী যুগোপযোগী করতে হবে।
- (11) মাধ্যমিক ও ডিগ্রি পরীক্ষার কেন্দ্র থানা সদরের নিচের পর্যায়ে হবে না।
- (12) কর্মদক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য এক বোর্ড থেকে অন্য বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বদলির ব্যবস্থা করতে হবে।
- (13) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় অংশ ও বহিঃ মন্যায়ন ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- (14) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থায় ধারাবাহিক মন্যায়ন যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে, তাই কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান পরীক্ষা ও মন্যায়ন পদ্ধতি অব্যাহত রাখা যেতে পারে।
- (15) প্রাথমিক থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত কোন স্তরেই শিক্ষার্থীদের জন্য কোন গাইড বই, নোট বই রাখা চলবে না। প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং সেন্টার নিষিদ্ধ করতে হবে।
- (16) শিক্ষক ছাত্র অনুপাত হবে প্রাথমিক স্তরে ১ঃ৩৫ এবং মাধ্যমিক স্তরে ১ঃ৪০।

### ছাত্রকল্যাণ ও নির্দেশনাঃ

শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ব্যয়ভার লাঘব করে ছাত্রছাত্রীদের অধ্যয়নে উৎসাহিত ও প্রয়োজনীয় ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা এবং পাঠ্যটিরিত্ত কার্যক্রমের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

অনেক সময় বহু সমস্যার আবেতে অনেক শিক্ষার্থী বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, ফলে অনেকের জীবন বিনষ্ট হয়। তাই ছাত্র নির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্মসূচি কার্যকরভাবে প্রবর্তন করা বাঞ্ছনীয়। তা করা হলে বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা সহজ হবে এবং শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে।

### সুপারিশঃ

- (1) প্রাথমিক স্তরে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ চালু রাখা এবং মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের স্বল্পমূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।
- (2) দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর বৃত্তিদানের ব্যবস্থা এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যাংক খাণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- (3) কর্তৃপক্ষের সাহায্য, নাগরিকদের দান, প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের অনুদান নিয়ে প্রতি শিক্ষায়তনে ছাত্রকল্যাণ তহবিল গঠন করে অভাবগ্রস্ত মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে হবে।
- (4) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীদের জন্য পুষ্টিকর টিফিন দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগসহ প্রতিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা কেন্দ্র থাকতে হবে।

- (5) প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে ব্যায়ামাগার থাকবে।
- (6) ছাত্রদের সার্বিক কল্যাণের স্বার্থে ছাত্র রাজনীতির একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে মহামান্য রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিক দল, ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসক ও অভিভাবক প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি গোলটেবিল বৈঠক ডাকতে পারেন।
- (7) শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ও যে কোন জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্মসূচি চালু করতে হবে এবং একটি জাতীয় নির্দেশনা ও পরামর্শকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।
- (8) যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্মসূচি বিদ্যমান আছে সেগুলো আরও জোরদার করতে হবে।

### ছাত্রছাত্রী ভর্তিঃ

- (1) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে নির্বাচনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং ভর্তির যোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।
- (2) ছাত্রছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্লাসের ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা যাবে না।
- (3) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে কোড পদ্ধতি অবলম্বন করে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

### শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষকদের মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব

#### শিক্ষক প্রশিক্ষণঃ

শিক্ষা ও শিক্ষকের মান উন্নয়ন এবং শিক্ষকের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় শিক্ষক প্রশিক্ষণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাই শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন প্রয়োজন। আমাদের দেশের প্রচলিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা খুবই গতানুগতিক, অসম্পূর্ণ, সনদপত্র সর্বস্ব, তত্ত্বীয় বিদ্যাপ্রধান, ব্যবহারিক শিক্ষা অপর্শ, মুখস্থবিদ্যার ওপর নির্ভরশীল এবং পুরনো পরীক্ষা পদ্ধতি বিরাজমান, তাই আশানুরূপ ফললাভ হচ্ছে না। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ১০টি প্রশিক্ষণ কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য একটি শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট রয়েছে। ১০টি প্রশিক্ষণ কলেজেই বি এড ডিগ্রি দেওয়া হয়। ঢাকা, ময়মনসিং (পুরুষ) ও রাজশাহী প্রশিক্ষণ কলেজে এমএড ডিগ্রিও প্রদান করা হয়। দেশে ৫টি প্রাইভেট প্রশিক্ষণ কলেজ রয়েছে। এছাড়া ১৯৮৫ সাল থেকে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা শিক্ষণের মাধ্যমে প্রতি বছর বিএড ডিগ্রি প্রদান করছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ৫৩টি সরকারি ও ২টি বেসরকারি প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট রয়েছে। এগুলোতে এক বছর মেয়াদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বর্তমানে যে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে তা অপ্রতুল, চাহিদার তুলনায় অপরিপূর্ণ এবং যুগোপযোগী নয়।

## সুপারিশঃ

- (1) শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসচিৰ আধুনিকীকরণ প্রয়োজন।
- (2) প্রশিক্ষকদের পরিবর্তিত নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসচিৰ প্রবর্তনের আগেই নিজ নিজ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এ সম্পর্ক পর্যাপ্ত জ্ঞান ও ধারণা থাকতে হবে।
- (3) প্রশিক্ষকদের মানোন্নয়নের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষদের জন্যও বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।
- (4) প্রশিক্ষণহীন শিক্ষকদের একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- (5) প্রশিক্ষণার্থীদের কমপক্ষে তিন মাস ব্যবহারিক পাঠদানের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে।
- (6) ব্যবহারিক পাঠদানের জন্য যে দুটি বিষয় নির্বাচন করতে হবে সে দুটি বিষয় ছাত্রজীবনে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষালাভ করেছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- (7) প্রশিক্ষণে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের ব্যাপক ব্যবস্থা করা ও প্রশিক্ষণার্থীদের ভূমিকার উপযুক্ত ম্যায়নের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- (8) সকল শিক্ষকের জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, কর্মরত শিক্ষকদের জন্য কর্মকালীন প্রশিক্ষণ ও প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর সঞ্জীবনী কোর্সের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- (9) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ শিক্ষা, প্রতিবন্ধী, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক) ভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালনের উপযোগী দক্ষ শিক্ষক সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসচিৰ বিষয়বস্তুর তারতম্য থাকবে।
- (10) প্রশিক্ষণার্থীদের আর্থিক মঞ্জুরি বাড়ানো এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।
- (11) প্রশিক্ষণ কলেজ আরও বাড়তে হবে এবং সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর আবাসিক ব্যবস্থা করতে হবে।

## শিক্ষকদের মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্বঃ

প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত সর্বত্রই শিক্ষকদের করুণ অবস্থা। শিক্ষকতা পেশায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা পেলেও উচ্চতর প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত সমযোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের তুলনায় তাঁদের মর্যাদা, বেতন ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা কম। সরকারি শিক্ষকবৃন্দ বেসরকারি শিক্ষকদের তুলনায় উন্নততর অবস্থানে থাকলেও অন্যান্য সমযোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের চেয়ে তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে নিম্ন মর্যাদার স্তরে রয়েছেন। বেসরকারি শিক্ষকদের অবস্থা আরও খারাপ। তাই তাঁরা জীবিকা নির্বাহের তাগিদে খন্দকালীন কাজ, টিউশনি, কোচিং সেন্টার ইত্যাদিতে অধিক সময় ও শ্রম শক্তি ব্যয় করেন। ফলে আদর্শ শিক্ষকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, তাঁদের মান ও ক্রমশ নিম্নমুখী হচ্ছে।

## সুপারিশঃ

- (1) সমযোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিভিন্ন স্তরের ও ধারার শিক্ষকদের বেতন ভাতার বৈষম্য দূর করতে হবে এবং সরকারি প্রশাসনসহ অন্যান্য পেশায় একই অথবা সমমানের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বেতন সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে।
- (2) আগামী দশ বছরের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকদের বৈষম্য দূর করে সমান বেতন ভাতা, পেনশনসহ সকল আর্থিক সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করতে হবে।
- (3) দায়িত্ব পালনকালে, পরীক্ষায় নকল ও অসদুপায় অবলম্বন বন্ধ করতে গিয়ে যে সকল শিক্ষক সনসী ও দুষ্কৃতকারীদের হামলায় নিহত, আহত ও লাঞ্চিত হন তাঁদের নিরাপত্তা বিধান ও অপরাধীদের শাস্তিবিধানের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। নিহত শিক্ষকের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যদান ও আহতদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে।
- (4) সরকারি খরচে বিদেশে পড়াশোনা, গবেষণা, শিক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলনে অংশগ্রহণ, বিদেশী বৃত্তি প্রদান ইত্যাদি ব্যাপারে শিক্ষক ও শিক্ষার সংগে জড়িত কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- (5) মহিলা শিক্ষকদের চাকরিতে নিয়োগসহ কোন ক্ষেত্রেই পুরুষের সংগে বৈষম্য রাখা চলবে না। সমযোগ্যতাসম্পন্ন মহিলাদের বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- (6) পার্বত্য জেলার শিক্ষকদের পাহাড়ি ভাতা প্রদান করতে হবে।
- (7) পেশাগত আচরণ বিধি লংঘনের দায়ে অভিযুক্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শাস্তিমূলক পদক্ষেপসমূহ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিত। অভিযুক্ত শিক্ষকের আত্মপক্ষ সমর্থনের ও ন্যায়বিচার লাভের সুযোগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- (8) শিক্ষাক্ষেত্রে ও সমাজে বিশেষ অবদান, মৌলিক রচনা ও গ্রন্থ প্রকাশনার জন্য শিক্ষকদের সম্মানিত ও উৎসাহিত করতে হবে। উন্নতমানের প্রকাশনা ও গবেষণাকে তাঁদের পেশাগত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য করে পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হবে।
- (9) শিক্ষক সংগঠনগুলোর উচিত শিক্ষকদের নৈতিক বা আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করা এবং এ নীতিমালা অনুসৃত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা। এ ব্যাপারে সরকারও একটি উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে পারে।

## শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসি ও পাঠ্যপুস্তকঃ

শিক্ষার মূল প্রশারবিন্দু শিক্ষাক্রম। তাই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফল ঘটবে এটা যেমন প্রত্যাশিত, তেমনি শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণযোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম প্রণীত হবে এটাও কাঙ্খিত। যেহেতু একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা দেশের বিরাজমান আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, দীর্ঘদিনের লালিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক ও মানবিক মন্যবোধের ওপর গড়ে ওঠে; তাই, পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাক্রমে ঐগুলোর প্রতিফলন সুনিশ্চিত করতে হয়। মূলত শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও কাঙ্খিত আচরণিক পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি দক্ষ, দেশপ্রেমিক, আত্মনির্ভরশীল, নৈতিক মন্যবোধসম্পন্ন, শ্রমনিষ্ঠ সুনামগরিক জনগোষ্ঠী

গড়ে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষাকে এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর সোপান হচ্ছে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসচি। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসচির আলোকেই রচিত হয় পাঠ্যপুস্ক। তাই শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসচি ও পাঠ্যপুস্কের গু রুত্ব অপরিসীম।

## সুপারিশঃ

### ক. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসচিঃ

- ১) প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসচি হবে এক ও অভিন্ন।
- ২) প্রাথমিক স্তরের এ শিক্ষাক্রম যোগ্যতাভিত্তিক (Competency based) ও আবশ্যকীয় শিখনক্রমের (Essential Learning Continuum) ভিত্তিতে রচিত হবে।
- ৩) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসচিতে ধর্মীয়, সমাজিক, মানবীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটবে।
- ৪) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে ও পাঠ্যসচিসহ শিক্ষার প্রতিটি স্তর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মাতৃভাষা, আপন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রতিফলন ঘটবে।
- ৫) আত্মকর্মসংস্থান ও শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থী যেন আগ্রহী হয় তার প্রতিফলন ঘটবে।
- ৬) জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন এবং দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন যেন হয় তার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

### ক. পাঠ্যপুস্কঃ

১. প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্ক ও অন্যান্য পাঠসহায়ক সামগ্রীর মুদ্রণ ও প্রকাশনার ব্যাপারে বর্তমানে অনুসৃত নীতিমালা অব্যাহত থাকতে পারে।
২. মাধ্যমিক স্তরের জন্য শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যপুস্ক প্রশয়ন, মুদ্রণ, প্রকাশ ও বাজারজাত করণের বর্তমান অনুসৃত নীতি অব্যাহত থাকতে পারে।
৩. আগ্রহী ও সমর্থবান অভিভাবকরা যেন খোলাবাজারে ক্রয় করতে পারে সেজন্য সাদা কাগজে মুদ্রিত পাঠ্যপুস্ক বিক্রয়ের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।
৪. দেশের ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য বিনামূল্যের প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্ক সরবরাহের নীতিমালা পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। বিশেষত শহরাঞ্চলের সচ্ছল শিক্ষার্থীদের মধ্যে ন্যনতম মূল্যে বই প্রাপ্তির ব্যবস্থা বিবেচনা করা যায়।
৫. প্রাথমিক স্তর একজন শিক্ষার্থীর জন্য প্রতিবছর একটি করে বই একবার মাত্র ব্যবহার করা আমাদের মতো দরিদ্র দেশের জন্য বিরাট অপচয়। তাই এ স্তরের বই কিভাবে একাধিক শিক্ষাবর্ষে ব্যবহার করা যায় সে জন্য নীতিমালা প্রশয়ন করতে হবে।
৬. মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্ককে আকর্ষণীয়, নির্ভুল ও সুন্দরভাবে মুদ্রণের প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

৭. মাধ্যমিক স্তরের সীমিত সংখ্যক পাঠ্যপুস্তক আগ্রহী ও সমর্থ ক্রেতাদের জন্য সাদা কাগজে মুদ্রণ করা যায়।
৮. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন ও মুদ্রণের গুণগতমান ও ধারাবাহিক ক্রমোন্নয়ন পর্যালোচনা ও বিশেষণের জন্য একটি 'পাঠ্যপুস্তক আর্কাইভ' প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।
৯. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত বইয়ের লেখকদের এককালীন সম্মানী ও নির্ধারিত হারে রয়্যালটি প্রদান করতে হবে।
১০. সরকারি অর্থানুকূলে উচ্চ শিক্ষার জন্য নির্ধারিত পুস্তক এবং উন্নতমানের সৃষ্টিশীল গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য প্রকাশকদের উৎসাহিত করা প্রয়োজন।
১১. পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন, পরিমার্জন ও সংস্কার সাধনের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির দিকনির্দেশনা গ্রহণ করা হবে।
১২. পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন ও উন্নয়নের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

#### খ. পাঠ্যপুস্তক প্রশয়নের নীতিমালাঃ

১. বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক প্রশয়নের যে নির্দেশনা বর্তমান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসচিত্রে রয়েছে তা অনুসরণ করা যায়।
২. পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসচিত্র প্রতিটি বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনার যে নীতিমালা নির্দেশ করা হয়েছে, সে অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক প্রশয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

#### গ. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডঃ

১. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে পেশাগত ক্ষমতাসমপন্ন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্থায়ী লোকবল দিয়ে সমৃদ্ধ করতে হবে।
২. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক উন্নয়নে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, দক্ষ, অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে থেকে উপদেষ্টা নিয়োগ করা যেতে পারে।

#### শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাঃ

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও কলেজের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে অনিয়ম ও অসমনীতি চলছে তার নিরসনকল্পে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে কলেজ পর্যন্ত (মাদ্রাসাসহ) শিক্ষায় শিক্ষক নিয়োগের জন্য একটি পৃথক 'শিক্ষা কর্ম কমিশন' প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যিক।

## প্রাথমিক শিক্ষাঃ

সমন্বিত ও সুসংগঠিত শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ব্যতীত প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। অতীতে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনেও শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিশেষজ্ঞদের সুপারিশের আলোকে ইতোমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে বিশাল কাঠামো, তবুও অনস্বীকার্য যে এসব সুপারিশ অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তবায়িত হয়নি। তাই প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বর্তমান সময়ের বাস্তবতা ও চাহিদার আলোকে পুনর্বিদ্যায়িত করা আবশ্যিক।

## সুপারিশঃ

১. প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন।
২. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে মহিলাদের আরও অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।
৩. শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে একটি পৃথক “শিক্ষা কর্ম কমিশনের মাধ্যমে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করা প্রয়োজন।
৪. বর্তমানে শিক্ষকদের খানার বাইরে বদলির নিয়ম না থাকায় প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। প্রয়োজনে শিক্ষকদের আনুষংগিক খানা বদলির নীতি প্রণয়ন করতে হবে।
৫. প্রধান শিক্ষক শিক্ষকদের বাৎসরিক মন্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করবেন।

## মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাঃ

দেশের শিক্ষার সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের ওপর। আমাদের বর্তমান শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ এবং সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান প্রশাসনিক পদ্ধতির পুনর্বিদ্যায়িত অত্যন্ত জরুরি। আমাদের দেশে শিক্ষা উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। এ সমস্প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যাপক সমৃদ্ধসারণ ও গুণগত উৎকর্ষ সাধনের কাজ চলেছে এবং এর সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করছে সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ওপর।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রশাসনের লক্ষ্য হচ্ছে বর্তমান শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান অসুবিধা ও ত্রুটিবিচ্যুতি চিহ্নিত করা এবং তা দূর করা। আধুনিক, যুগোপযোগী, বাস্তবমুখী শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থায় পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ প্রবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করা।

## সুপারিশঃ

১. শিক্ষা প্রশাসনে ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তৃত্বকে বিভাগীয়, জেলা ও থানা পর্যায়ে পর্যাপ্ত বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।
২. জেলা শিক্ষা অফিসারের পদটি জেলার অন্যান্য কর্মকর্তার সংগে সামঞ্জস্য বিধান করে উপ-পরিচালক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে।  
একাডেমিক তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ জোরদার করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের সংখ্যানুপাতে বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করতে হবে যেন প্রতিটি বিদ্যালয় তিন মাসে অন্ত একবার পরিদর্শন করা সম্ভব হয়।

৩. বর্তমানে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তত্ত্বাবধান ও দেখাশোনার জন্য থানা পর্যায়ে কোন প্রকার ব্যবস্থা নেই। মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখাশোনার জন্য থানা পর্যায়ে একটি সহকারী পরিচালক ও একটি বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করতে হবে।
৪. অধিদপ্তরে বর্তমান উগওঝ কশিউটার সেনকে সম্ভ্রসারণ করে আধুনিকীকরণ করা প্রয়োজন।
৫. স্কুল ও কলেজের শিক্ষার সংগে জড়িত শিক্ষাবিদদের ব্যবস্থাপনায় অধিক হারে সম্ভ্রত করতে হবে। মেধা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নির্বাচিত শিক্ষকদের শিক্ষা প্রশাসনে নিযুক্ত করা যেতে পারে এবং তাঁদের পদোন্নতির সুযোগ থাকতে হবে।
৬. স্কুল ম্যাপিং কার্যক্রমের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে অনুমোদন প্রদান করা যায়।
৭. শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রমকে স্বচ্ছতায় এনে প্রয়োজনে একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠন করা যেতে পারে। বর্তমান বোর্ডসমূহ (মাদরাসা ও কারিগরিসহ) কেন্দ্রীয় বোর্ডের শাখা হিসেবে কাজ করবে এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরি বোর্ডসমূহের মধ্যে বদলিযোগ্য হবে।
৮. সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিয়োগের জন্য একটি অভিন্ন নিয়োগ বিধি ও সুষ্ঠু নীতিমালা থাকা বাঞ্ছনীয় এবং এজন্য একটি পৃথক পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন করা প্রয়োজন।
৯. সরকারি/বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দম্বীকরণ এবং তাদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেতনের ১০০% সরকার থেকে প্রদান করা যেতে পারে এবং কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করে চিকিৎসা ব্যয়, অকালমৃত্যুতে পরিবারকে এককালীন সাহায্য করা, পেনশন/ অবসরকালীন, এককালীন আর্থিক সুবিধা প্রদান ইত্যাদি ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
১০. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা বাঞ্ছনীয়। এই নীতিমালায় জাতীয়করণকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/ কর্মকর্তা/ কর্মচারীর চাকরি সংক্রান্ত বিধি বিধান থাকতে হবে যাতে কর্ম কমিশন কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।
১১. ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকের সংখ্যানুপাতে সরকারি স্কুল, কলেজ, টিটি কলেজ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ জেলা শিক্ষা অফিস, আঞ্চলিক অফিস ও অধিদপ্তরে প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধির জন্য দ্বিতীয়/ তৃতীয়/ চতুর্থ শ্রেণীর পদ সৃষ্টি করতে হবে।
১২. সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রীদের অভিন্ন বেতন প্রদানের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।
১৩. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শিক্ষা ক্যাডারের সর্বোচ্চ পদের একজন কর্মকর্তা এবং পদমর্যাদার দিকে দিয়ে তিনি অতিরিক্ত সচিবের পর্যায়ের। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য এবং মেধা ও সময়ের অপচয় রোধ করার জন্য মহাপরিচালক কর্তৃক প্রেরিত সকল নথি সরাসরি সচিবের নিকট পেশ করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
১৪. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কর্মসূচি বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের মাধ্যমে সম্ভ্র করা হয়ে থাকে। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে প্রকল্পভুক্ত জনবলের চাকরিও শেষ হয়ে যায় এবং ডেপুটেশনে আগত কর্মকর্তাগণ তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে ফিরে যায়। ফলে প্রকল্প সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রয়োজন হলে পাওয়া যায় না এবং প্রকল্পের জন্য ক্রয় করা যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব হয়ে উঠে না। এসব

অসুবিধা দূর করার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রকল্প বাস্তবায়ন শাখা নামে একটি নতুন সেল সৃষ্টি করা যেতে পারে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মসূচি এ সেল-এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যায়।

১৫. ব্যক্তি মালিকানাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একটি সুস্থ খল ব্যবস্থাপনায় আনা দরকার। প্রয়োজনে এ সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। সমতার ভিত্তিতে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার মাধ্যমে এ সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১৬. শিক্ষকদের চাকরির বয়সসীমা ঘাট বছরে উন্নীত করতে হবে।

## অর্থায়নঃ

শিক্ষার বিনিয়োগ ও তার সংগে অর্থ সামাজিক প্রতিদানের ইতিবাচক সম্পর্ক নিয়ে এখন আর সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে দ্বিমত নেই। তবে শিক্ষা যেহেতু জীবন ও জীবিকার আশ্রয়স্থল তৈরি করে, সেজন্য শিল্পে ব্যয় ও শিক্ষাখাতে ব্যয় একই দৃষ্টিতে মন্যায়ন করা যায় না। শিক্ষা বাবদ ব্যয় ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিতে একটি প্রয়োজনীয় শর্ত বলে সকলে মেনে নিয়েছে। জাতীয় আয়ের সামান্য পরিমাণই শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করা হয়। এর অনুপাত ১৯৭২-৭৩ এ ছিল ১.৮%, সাম্প্রতিককালে এ অনুপাত ২.৩-এ দাঁড়িয়েছে। জাতীয় উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে মানব সম্পদের সার্বিক উন্নয়ন। জাতীয় উন্নয়ন অর্জন করতে হলে উৎপাদক শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রধান উপাদান। বর্তমানে যে পরিমাণ অর্থ শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হয় তা অপ্রতুল।

## সুপারিশঃ

- ১) ২০০০ সাল নাগাদ শিক্ষাখাতে ক্রমান্বয়ে জাতীয় আয়ের বর্তমান বরাদ্দ ২.৩% থেকে ৫.০০% এ উন্নীত করতে হবে। প্রতি বছর ১% হারে বাড়ানো যেতে পারে। জাতীয় আয়ের ৭% শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করতে পারলে শিক্ষাকে সর্বজনীন পর্যায়ে নেওয়া সম্ভব হবে।
- ২) বিত্তবানদের আয়ের উপর শিক্ষা কর হিসেবে কর প্রবর্তন করে শিক্ষা খাতের জন্য অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করা যেতে পারে। এই কর ইউনিয়ন পর্যায়ে থেকে জেলা পর্যায়ে ও পৌর এলাকায় স্থানীয় সরকার আদায় করতে পারে এবং তা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা যেতে পারে।
- ৩) ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধির প্রসঙ্গ বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিভিন্ন ফোরামে আলোচিত হচ্ছে। বেতন বৃদ্ধি করতে হলে বিষয়টি আরও ব্যাপকভাবে আলোচিত হওয়া দরকার। বেতন বৃদ্ধি করতে হলে শেষ পর্যন্ত একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হবে। বেতন বৃদ্ধি করা হলে সেই সংগে শিক্ষা খাশ ও বৃত্তি যুক্তিযুক্ত মাত্রায় প্রবর্তন করার প্রয়োজন হবে।
- ৪) বেসরকারি উদ্যোগ বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার প্রসার উৎসাহিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীর অনুদান করমুক্ত করার প্রয়োজন হবে। তবে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত না হয় এবং শিক্ষার মান রক্ষা করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- ৫) অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিপুল পরিমাণ অর্থ বিভিন্ন ব্যাংকে রিজার্ভ হিসেবে গচ্ছিত রয়েছে। এই গচ্ছিত অর্থ একত্র করে প্রারম্ভিক মঙ্গলন হিসেবে ব্যবহার করে শিক্ষা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা

করা যেতে পারে। প্রয়োজনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ ব্যাংক থেকে বিশেষ করে ভৌত কার্ঠামো তৈরীর জন্য ঋণ গ্রহণ করতে পারে।